ছাতির বাঁশ বাড়লে যে উই

অভীককুমার দে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সি এফ এন্ডরুজ এবং রবীন্দ্রনাথ
রেখাঙ্কন: শম্ভু সাহা

ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ
নীল গগনে।
আমি কেন একলা বসে
এই বিজনে।
বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে
শিউলিগুলি,
তাই তো কুঁড়ি কাননজুড়ি
উঠছে দুলি,
শিশির-ধোওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া
লাগল বনে
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই
আপন মনে॥

বনের পথে কী মায়াজাল
হয় যে বোনা,
সেইখানেতে আলোছায়ার
চেনাশোনা।
ঝরে-পড়া মালতী, তার
গন্ধশ্বাসে
করুণ-আভাস দিয়ে গেল এই
ঘাসে ঘাসে।
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের
আন্দোলনে।
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই
আপন মনে॥

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩
ম্যুনিক

ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই

অভীককুমার দে

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে ‘হরপ্পা’-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ৭ অগস্ট ২০২০
বাইশে শ্রাবণ ১৪২৭ প্রকাশিত হল
‘ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই’

তথ্যসংশ্লেষ ও লিখন
অভীককুমার দে

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহযোগিতা
সৌম্যদীপ

সম্পাদক
সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পাদপীঠে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের জীবন-ইতিহাসের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে ময়মনসিংহের জমিদার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে ১৯৩৮-এর ২ জুলাই লেখা তাঁর চিঠিতে চোখ আটকে গেল। কালিম্পং থেকে কবি লিখেছিলেন: "এখানে শরীর অনেকটা ভালো, মনও আছে আরামে তার প্রধান কারণ এখানকার নির্জনতা— তোমাদের বাড়িটিরও গুণ আছে। ... তোমার সাদর আমন্ত্রণ অনুসারে এইখানেই শরৎকাল যাপন করব— সকলেই বলচে সেই সময়টা মনোরম এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।"[১] দেহ-

মনের স্বাস্থ্যের কারণে স্থানবদল যতবারই হোক, তবু তাঁর স্থায়ী আসন শান্তিনিকেতনেই পাতা।

সুর আছে, গভীর চিন্তার প্রকাশ আছে, রং-তুলির রাজ্যপাট জাঁকিয়ে বসেছে মনের উপর, আশ্রমভাবনা, বিশ্বভারতী ও তার নানা সমস্যা, সে-ও ঘিরে ধরে অনবরত। শরীরও ভাঙছে, বার্ধক্যের ছায়াও ধীরে ধীরে ঘনাচ্ছে, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

১৯৪০-এর ১৯ সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন: "কিছুদিন থেকে আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়চে, দিনগুলো বহন করা যেন অসাধ্য বোধ হয়। তবু কাজ করতে হয়েছে তবু এত অরুচি বোধ সে বলতে পারি নে। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে পালিয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে— বিধান রায় আশঙ্কা করেন হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে। সেই জন্যে কালিম্পঙে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মন বিশ্রামের জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছে যে তাঁর নিষেধ মানা সম্ভব হোলো না। চল্লুম আজ কালিম্পঙ।"

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও বনমালীকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন কালিম্পঙে পৌঁছলেন। তাঁর বউমা প্রতিমা দেবী আগেরবারের মতোই তখন সেখানে, ওই গৌরীপুর লজে। তিনি লিখেছেন: "উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় শুনি হর্ন বাজাতে বাজাতে প্রকাণ্ড মোটরটা পাহাড়ের সরু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছে। গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল; আমরা এগিয়ে গেলুম, সুধাকান্ত দেখলুম আগেই নেমে পড়েছে, তার পর বাবামশায়কে হাত ধরে নামিয়ে নিলে। এবার তাঁকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা

হল, চৌকিতে বসলেন, আমরা সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। বাবামশায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, 'বউমা মৈত্রেয়ী লিখেছিল ওর ওখানে যেতে কিন্তু সেখানে যেতে সাহস হল না, আমি এখানেই এলুম। ডাক্তাররা বলছেন আমার কখন্ কী হয়, তাই তোমাদের কাছাকাছি থাকাই ভালো। আমাকে এবার বড়ো ক্লান্ত করেছে, ভিতরে-ভিতরে দুর্বল বোধ করছি, মনে হচ্ছে যেন সামনে একটা বিপদ অপেক্ষা করে আছে'।"

সুধাকান্তবাবুর মুখে শোনা গেল, ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও কবির জেদের কাছে তাঁদের সকলকে হার মানতে হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছিলেন, "আপনার শহরের কাছ থেকে দূরে যাওয়া উচিত নয়, যেখানে ডাক্তার সহজে পাওয়া যায় এমন জায়গার কাছাকাছি আপনার থাকা দরকার।" রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল, "আচ্ছা মংপু যাব না কিন্তু কালিম্পঙে যেতে তো বাধা নেই, সেটা তো আর গতিবিধির বাইরে নয়।" গতিবিধির বাইরে হয়তো নয় তবে অন্তত সেকালের কালিম্পঙে গৌরীপুর লজের অবস্থান ছিল শহর এলাকা থেকে বেশ অনেকটাই দূরে। যাইহোক আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের এবারে কালিম্পং-বাসের প্রথম কয়েকটা দিন বেশ ভালোই কেটেছিল। সুধাকান্তবাবুকে বললেন, "তুই যা শান্তিনিকেতনে, তোর ছেলের অসুখ করেছে, তার কাছে তোর থাকা দরকার।" সারাদিন নিজের লেখাপত্র নিয়ে মগ্ন থাকতেন, বেশ কিছুক্ষণ সকলের সঙ্গে গল্প গুজবও করতেন। বিকেলে চায়ের পর বউমার হাত ধরে কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারিও করছিলেন, বলেছিলেন, "বউমা, আমার একটু বেড়ানো দরকার, বসে থেকে-থেকে আমার পা-গুলো অসাড় হয়ে আসছে।"

২৫ সেপ্টেম্বর। সকালে দেখা গেল, দরজাজানালা সব খুলে দিয়েছেন, "একটু দূরে বনমালী চায়ের আয়োজন করছে, আকাশ-প্রান্তিকে উদয়াচলের খোলা দ্বার দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধবল শিখরের উদার ঋজু দেহ, সেই অসীম স্তব্ধতার আবরণ ভেদ করে বাতায়ন পথে ধ্যাননতলোচন কবির শুভ্রকেশ ও কপালের উপর এসে পড়েছে শঙ্করের প্রথম আলোক-আশিস, আর গায়ের উপর দিয়ে বইছে নবপ্রভাতের বিশ্বব্যাপী মধুর স্পর্শ। নীচের বাগানে লেগেছে নানা রঙে ও গন্ধে মিলে লতাপাতার হুল্লোড়, কবির প্রাণ আর তাদের প্রাণ আজ এক হয়ে গেছে।

আমি বনমালীকে ডেকে আস্তে-আস্তে বললুম 'এত সকালে ঠাণ্ডায় জানালা খুলে দিয়েছিস, করেছিস কি, ঠাণ্ডা লাগবে যে।' বনমালী বললে, 'বাবামশায়ের হুকুম, না খুললে রাগ করবেন।'

যখন চা খাবার জন্যে উঠে এলেন, বললুম, 'বাবামশায়, নূতন ঠাণ্ডা, এখানে আপনি একটা গরম জোব্বা পরুন, কেবলমাত্র আলোয়ান এখানকার পক্ষে যথেষ্ট নয়।' বাবামশায় হেসে বললেন, 'তোমরা বড়ো শীতকাতুরে, এ কি আবার ঠাণ্ডা।' তারপর চা খাওয়া শেষ করে লেখবার ঘরে গিয়ে বসলেন, ...।"[৩]

দুপুরে অমিয় চক্রবর্তীকে সকালে লেখা কবিতাটি পাঠিয়ে কালিম্পঙে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন:

২৫সেপ্টেম্বর ১৯৪০

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্চে যেন। শারদা পদার্পণ

করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্তদিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণেক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জরণ। তারি একটুখানি নমুনা পাঠাইঃ—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দের মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ
জানে তা কি এ কালিম্পঙ?
ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটিদিন বরমাল্য পরাইল তারে
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ?

২৫।৯।৪০

লিখতে রীতিমত কষ্ট বোধ হয়। চিঠির প্রথমাংশসমেত কবিতাটি যদি কপি করে পরিচয়-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঠিকানায় পাঠাতে পার খুশি হব। ইতি

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

গৌরীপুর লজ, কালিম্পং

এখানে শরৎকালটা রমণীয়, যদি কিছু দিন কাটিয়ে যেতে পারো ভালো লাগবে, আমারো লাগবে ভালো। এখানে লেখাপড়ার কাজ অবাধে করতে পারবে।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ[৪]

চিঠি শেষ করে প্রতিমা দেবীকে ডেকে বললেন, "অমিয়কে এখানে আসতে লিখলুম বউমা। তুমি কর্ত্রী, তোমার মতটা নেওয়া দরকার।" তিনি হেসে বললেন, "বেশ হবে, অমিয়বাবু এলে আপনার ভালো লাগবে।" সন্ধ্যার সময় বললেন, কাল "মাংপবী আসবে, আর, আজকে শরীরটা খারাপ হল, আজ রাতে ওষুধটা বউমা খাব, তা হলে কাল শরীর ঠিক হয়ে যাবে।" সেদিন বিকেল থেকেই কিছু শারীরিক অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ইদানীং তাঁর পা ফুলত বলে রোজই শোওয়ার আগে তেলমালিশ করে দেওয়া হত। সেদিনও মালিশ করে দিতে দিতে তন্দ্রা আসছিল, প্রতিমা দেবীকে "ডেকে বললেন, 'বউমা, আমি এইবার শুতে যাই, তুমি বায়োকেমিক ওষুধ গুলো রাতের মতো আমার টেবিলে রেখে যেয়ো'।" কবির শোবার ঘরের বিপরীত দিকে প্রতিমা দেবীর ঘর। একসময় ঘুম ভেঙে টের পেলেন বাবামশায়ের ঘরে আলো জ্বলছে, বনমালী উঠেছে, সে-ঘরে গিয়ে দেখলেন, কয়েকটা ওষুধের শিশি নিয়ে কবি ইজ়িচেয়ারে বসে আছেন। তাঁর শরীর ভালো লাগছিল না, এবার তিনি বিছানায় গিয়ে শুলেন। প্রতিমা দেবী জানলার পর্দাগুলো টেনে দিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। 'এদিকে দেখি বেলা সাতটা আন্দাজ বাবামশায় ধীরে-ধীরে লেখবার ঘরে এসে বসলেন,

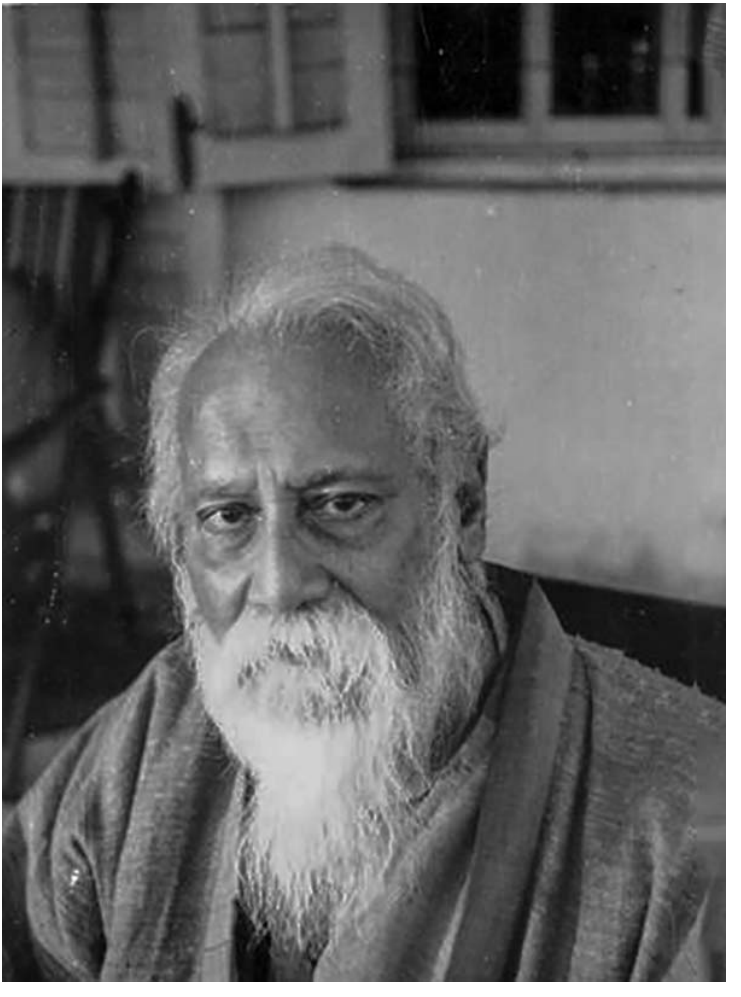

হাতে কবিতার খাতা, বুঝলুম এখন একটু ভালো আছেন, পায়ের উপর মোটাকম্বল ঢাকা দিয়ে দিলুম। কবিতার খাতা নিয়ে লিখতে লাগলেন, এইসময় এক পেয়ালা গরম কফিও খেলেন। আমি বললুম, 'একবার ডাক্তারকে ডাকাই।' ডাকবার অনুমতি দিলেন। অন্যসময় হলে ডাক্তার একেবারেই পছন্দ করতেন না, আজ আর কোনো আপত্তি করলেন না।"

সকালে স্থানীয় ডাক্তার গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দেখে বললেন, "ও কিছু নয়, একটু ওষুধ খেলেই কমে যাবে, হজমের গোলমাল মাত্র।" যে ওষুধ দিলেন তা বৃথাই। এরই মধ্যে মংপু থেকে সকন্যা মৈত্রেয়ী দেবী পৌঁছেছেন। কবি তাঁদের দেখে খুব খুশি, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অসুস্থ ভাব যেন মিলিয়ে গেল, কয়েকটি কবিতা পড়েও শোনালেন। একটু সুস্থ হলে নতুন লেখা গল্প 'ল্যাবরেটরি' পড়ে শোনাবেন, একথাও হল।

দুপুরবেলা থেকে তাঁর চেতনা ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। প্রতিমা দেবীরা সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা গোপালবাবু ওখানকার হাসপাতালের ডাক্তারকে নিয়ে আবার এলেন। তাঁরা উভয়ে রোগীকে পরীক্ষা করে জানালেন, "এ তো কিডনির অসুখ চলছে, যাকে বলে য়ুরিমিয়া।" বিধান দিলেন তখন থেকেই গ্লুকোজ় আর ডাবের জল খাওয়াতে হবে। সপ্তাহখানেক আগে কবির সঙ্গে দু-টি ডাব এসেছিল তাই রক্ষা, নইলে কালিম্পঙে ডাব কোথায়!

রাত্রে ঘুম ভালো হয়নি, কখনো শুয়েছেন কখনো বসেছেন, তবে চেতনার দিক থেকে তত আচ্ছন্ন নন, সকলকেই চিনতে পারছিলেন। ভোরেরবেলায় একটু হরলিকস তৈরি করে দেওয়া

হল, খেলেন; মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দু-একটা তামাশা করে কথাও বললেন। সকালটা মোটামুটি ভালোয়-ভালোয় কাটলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল কবির, উদ্‌বেগের সীমা নেই। ইতিমধ্যে টেলিফোনযোগে শান্তিনিকেতনে সচ্চিদানন্দ রায় (আলু) কবির অসুস্থতার খবর পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন, অনিল চন্দ জানালেন সেদিনই তাঁরা রওনা হচ্ছেন।

শহর থেকে মৈত্রেয়ী দেবী কলকাতায় বিশ্বভারতী অফিসে ফোন করে খবর জানালেন যাতে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে করে হোক যোগাযোগ করা হয়। সম্ভবত তিনি তখন জমিদারির কাজে পতিসরের কোনো গ্রামে ছিলেন। মৈত্রেয়ী ফিরে এসে জানালেন, "আজ রাত্রে দার্জিলিং থেকে ডাক্তার আসবার বন্দোবস্ত হয়েছে এবং কলকাতাতেও ফোন করে দিয়েছি।" প্রতিমা দেবীও কলকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে দূরভাষ যোগে জানালেন, যেন পরদিন সকালের মধ্যে তাঁরা কেউ-না-কেউ ডাক্তার নিয়ে ওখানে এসে পৌঁছন।

ইতিমধ্যে দার্জিলিং থেকে ইংরেজ সার্জেন এলেন রাত্রি আটটায়। তিনি এসেই বললেন, "ইনিই কি ডক্টর টেগর।" তারপর ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র হাতে বেঁধে ঘড়ি দেখতে লাগলেন, বললেন, "ব্লাডপ্রেসার খুব ভালো, হার্টপরীক্ষা করবার সময় পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিতে বাবামশায়ের লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ দেখে ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'ডাক্তার ঠাকুরের শরীরও কী সুন্দর।' (What a body Dr. Tagore has!) পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার অন্য ঘরে গেলেন।" ডাক্তার জানালেন কবির

য়ুরিমিয়া হয়েছে, ভিতরে-ভিতরে বিষক্রিয়া হওয়ার জন্য উনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। আজ রাতে অপারেশন নাহলে ওঁর জীবন-সংশয় হতে পারে। প্রতিমা দেবীকে ডাক্তার বারবার বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন অপারেশনের অনুমতি না-দিয়ে তিনি কতবড়ো ঝুঁকি নিতে চলেছেন। বললেন, "আপনি বারো ঘণ্টার জন্য বিপদ-সম্ভাবনা কাঁধে নিচ্ছেন, জানেন না, কাল কী ঘটতে পারে।" (Do you know Mrs. Tagore, you are taking the risk of 12 hours— you don't know what may happen to-morrow.)

প্রতিমা দেবীর যুক্তি ছিল যে, প্রথমত, তাঁর স্বামী সেখানে উপস্থিত নেই, দ্বিতীয়ত পরদিন সকালেই কলকাতা থেকে সেই ডাক্তাররা আসছেন যাঁরা কবির নিয়মিত চিকিৎসা করে থাকেন। সাহেব ডাক্তার এ-যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিজেও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কলকাতায় ফোন মারফত জানলেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই দার্জিলিং মেলে কালিম্পঙের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। বিদায় নেওয়ার আগে সার্জেন জানিয়ে গেলেন, ওঁরা এলে যে-কোনো প্রয়োজনে তিনি আবার আসবেন।

সেই রাত প্রতিমা দেবী-মৈত্রেয়ী দেবী সহ উপস্থিত সকলেরই যে কী উৎকণ্ঠায় কেটেছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝেই বলছেন, "আমার কী হল বলো তো।" ভাগ্যক্রমে তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তার, তাঁর মাধ্যমে কলকাতায় ডাক্তার জ্ঞান মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল এবং তাঁর পরামর্শ মতো ক্যানথিরিস৩০ দু-ঘণ্টা অন্তর খাওয়ানো শুরু হল।

প্রতিমা দেবীর কথায়: "সেই কথামত ওষুধ চলল সমস্ত রাত। সে যেন একটা ঝড়ের রাত। নিয়তির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছি, ঝোড়ো সমুদ্রে যে-জাহাজ ডুবুডুবু। তারই দিকে অসীম ভরসায় তাকিয়ে, মন তখন আতঙ্কে স্তব্ধ, কেবল ভরসা হচ্ছে বাবামশায়ের অপূর্ব জীবনীশক্তি তাঁকে এই দুর্যোগের রাত পার করিয়ে দেবে। ভোরেরদিকে মৈত্রেয়ীতে আমাতে অস্ফুট আনন্দ ধ্বনি করে উঠলুম, তাঁর চেতনা ফিরে এসেছে এবং অন্য-সব লক্ষণ ভালো দেখা দিয়েছে। তিনি আমাদের চিনতে পারলেন, এ নিশ্চয় ওষুধের গুণ। কালরাত্রি শেষ হল, আকাশে আলো তখন ফুটে উঠছে ধীরে-ধীরে।"

কলকাতার চিকিৎসকরা কখন এসে পৌঁছন তারই অধীর প্রতীক্ষা। যথাসময়ে গাড়ির হর্ন শোনা গেল, প্রশান্তচন্দ্র তিন সুপরিচিত চিকিৎসককে নিয়ে পৌঁছলেন। ডাক্তারদের মধ্যে জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, অমিয়নাথ বসু ও সত্যসখা মৈত্র এসেছিলেন সঙ্গে এম্ব্যুলেন্সও। একটু পরেই আরেকটা গাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ কর, অনিল চন্দ আর সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এলেন। টেলিগ্রাম এল রথীন্দ্রনাথও শিলিগুড়িতে আসছেন, পতিসরের গ্রামে থাকার দরুন তাঁর খবর পেতে দেরি হয়েছে, রেডিয়ো-স্টেশন থেকে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল কবির অসুস্থতার খবর তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্য। প্রতিমা দেবী লিখেছেন, "আমি একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম, ডাক্তাররা এসেই তখনই বাবামশায়ের ঘরে গেলেন। ঘরে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন, ওঁদের মধ্যে একজন সময় নষ্ট না করে তখনই গ্লুকোস ইন্‌জেক্‌সন দিয়েছিলেন। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে,

বিশেষ কিছু ভরসা পেলুম না, তবে তাঁরা এইটুকু বললেন যে, ‘গ্লুকোস ইন্‌জেক্‌সনের ক্রিয়া যদি আধঘণ্টার মধ্যে ভালো দেখি তাহলে আজই আমরা কবিকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করব।’ কাল রাত্রে যে অপারেশন হয়নি তাতে তাঁরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ... এঁদের সকলকে দেখে ঠিক সমুদ্রে জাহাজডুবি হবার মুখে রক্ষীজাহাজ এসে পড়লে আরোহীদের মনের অবস্থা যেরূপ হয় আমার সেই ভাব হল। ডাক্তারবাবুরা কিছুক্ষণ পরে আমাদের বললেন, ‘আপনারা প্রস্তুত হন, আজই ওঁকে আমরা নিয়ে যেতে পারব’।” ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত অনুসারে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিমা দেবীরা কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা আর ঘটেনি, সবই ভালোয়-ভালোয় কেটে গিয়েছিল। তার পরদিন জোড়াসাঁকোতে পৌঁছে দোতলার পাথরের ঘরে তাঁকে যখন শুইয়ে দেওয়া হল তখন তাঁর চেতনা অল্প ফিরে এসেছে, বললেন, “এ কোথায় আমাকে আনলে বউমা।” প্রতিমা দেবী বললেন, “এ যে আপনার পাথরের ঘর।” তিনি বলে উঠলেন, “হ্যাঁ, পাথরই বটে, কী কঠিন বুক, একটুও গলে না।” আমি নীরবে তাকিয়ে রইলুম।”[৫]

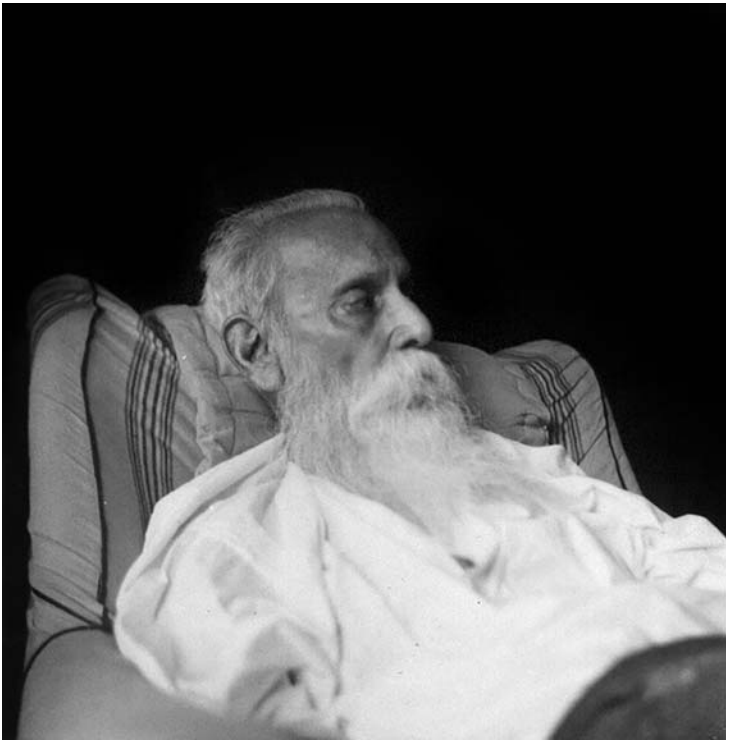

সেই পুরনো আবাসে চেতনে অচেতনে

বিশিষ্ট আটজন ডাক্তার নিয়ে গঠিত কমিটির অধীনে তখনই চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা শুরু হল। উপযুক্ত সেবক-সেবিকার একটি নির্বাচিত দল কবির সেবা-শুশ্রূষার ভার নিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০ সেপ্টেম্বর সূত্রে জানা যায়:

কালিম্পং হইতে রবীন্দ্রনাথের কলিকাতায় আগমন

স্টেশন হইতে এম্বুল্যান্সে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নীত

রবিবার অপরাহ্ণে দেহের উত্তাপ সামান্য বৃদ্ধি: অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি

অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া চিকিৎসকগণের অভিমত

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবিবার প্রাতে দার্জ্জিলিং মেলে কালিম্পং হইতে শিয়ালদহে পৌঁছেন। রাত্রে ট্রেনে মাঝে মাঝে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইলেও তিনি বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করেন নাই। তাঁহাকে একখানি ষ্ট্রেচারে করিয়া কর্পোরেশনের এম্বুলেন্সে তোলা হয় এবং জোড়াসাঁকোয় তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

এখন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নাই

কলিকাতায় পৌঁছিবার পর ডাঃ পি এন রায় ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী কবিকে পরীক্ষা করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জামসেদপুরে ছিলেন। তিনি অপরাহ্ণে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

অতঃপর তিনি কবির অন্যান্য চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করেন। ট্রেনে আসার জন্য কবির পীড়া বৃদ্ধি পায় নাই। চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, এখনই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নাও হইতে পারে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সোমবার বেলা ১০টার সময় পুনরায় রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন।

কবির অসুস্থতার খবর পেয়ে গান্ধিজি টেলিগ্রামযোগে তাঁর অন্তরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে জানালেন, "ভগবান গুরুদেবকে নিরাময় করুন। বিশ্বমানবের হিতার্থে ভগবান তাঁহাকে পূর্বের মত এ যাত্রায় রোগমুক্ত করিয়া আরও কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখুন।"

কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে কবিকে দেখে যান। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় অনুরোধ জানান হয় অসুস্থ কবির সংবাদ নেবার জন্য জনসাধারণ যা-তে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ভিড় না-করেন বা টেলিফোনযোগে খবর সংগ্রহের চেষ্টা না-করেন।[৬]

"জোড়াসাঁকোয় আসবার দু-দিন পরে ওয়ার্ধা থেকে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই এলেন পূজনীয় মহাত্মাজির বার্তা নিয়ে। সেদিন

কবির চেতনা ফিরে এসেছে কিন্তু জীবন-আশঙ্কার কারণ তখনো দূর হয়নি। মহাদেব দেশাই অনিলকুমারের সঙ্গে তাঁর ঘরে এসে, মহাত্মাজির সহানুভূতি, আন্তরিক প্রেম ও প্রীতি জানালেন। অনিলকুমার জোরে-জোরে মহাদেব দেশাই মহাশয়ের বার্তা গুরুদেবকে বুঝিয়ে দিলেন, কেননা তখন তিনি ভালো করে শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল, প্রতিমা দেবীর ভাষ্যে, "চোখের জল তাঁর এই প্রথম দেখলুম। নার্ভের উপর এত বেশি সংযম তাঁর ছিল যে, অতি বড়শোকেও তাঁকে কখনো বিচলিত হতে দেখিনি, আজ যেন বাঁধ ভেঙে গেল।"[৭]

Delhi
1 October 1940

Dear Gurudev,

You must stay yet awhile. Humanity needs you. I was pleased beyond measure to find that you were better.

With love,

Yours,
M. K. Gandhi

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে উত্তর প্রেরিত হল:

6 Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta

To: Mahatma Gandhi Wardha

Your constant good wishes have brought me back from the land of darkness into the land of light and life and my first offering of thanks goes out to you.

Rabindranath [৮]

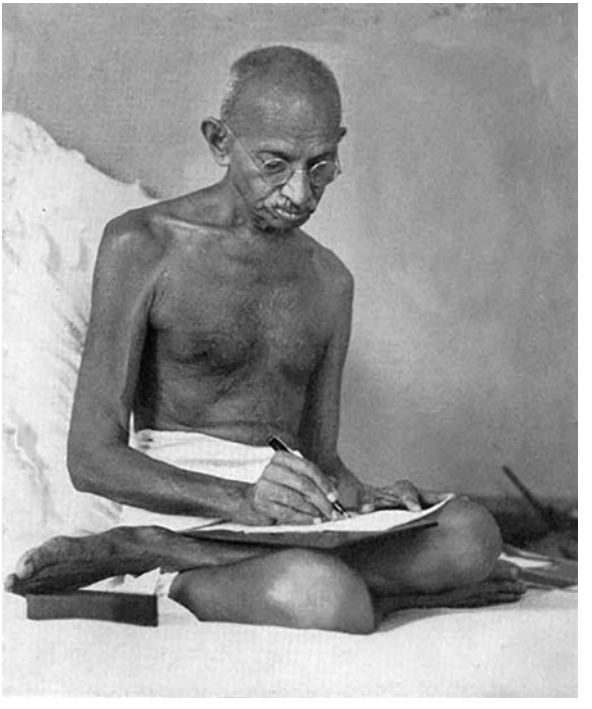

গান্ধিজি

কালিম্পং থেকে ফেরার পরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চেতনা অনেকটাই ঝাপসা ছিল, মাঝে-মাঝে তা ফিরে পেলেও আবার ঝিমিয়ে পড়তেন। ৬ অক্টোবর দুপুরে রানী মহলানবিশ একাই তাঁর কাছে বসে ছিলেন, হঠাৎ কবি চোখ খুলে বললেন, "একটা কাগজ নিয়ে এসে যা বলছি তা লেখো।" তারপর থেমে-থেমে ভেবে-ভেবে বলতে লাগলেন:

> We have known the primitive Mongols, the most terrible cruel horde of mankillers and we have the habit of calling them barbarous but the unalloyed sign of barbarism is reveald when all through the traping of so-called civilization comes out of the treason against humanity and that has been shown in the late history. We, who stand by the side of humanity, we may be victimised by the satanic power, we may be defeated in our enjoyment of human rights and yet we have the consolation to realize that man is great. And the time may or may not come when man will assert the dignity of freedom but we have the consolation to proclaim that man is great.[৯]

আর একদিন দুপুরে রানী দেখলেন লালবাড়ির বারান্দায় কিশোরীমোহন সাঁতরা দাঁড়িয়ে আছেন, রানীকে দেখে তিনি বললেন, "একবার কি গুরুদেবের কাছে যেতে পারি? আমি রোজই আসছি, খবর নিচ্ছি, কিন্তু কাছে যাই না অসুখ বেশী বলে। গুরুদেব হয়তো ভাবছেন এতদিন অসুখ কিন্তু আমি ওঁকে দেখতে এলাম না।" রানী রথীন্দ্রনাথের অনুমতি চেয়ে বিফল হলেন। শুনলেন, দেখা করা উচিত হবে না, জ্বর বেশী, আচ্ছন্নতাও রয়েছে, কিশোরীবাবুকে দেখার উত্তেজনায় ক্ষতি

হতে পারে। কিশোরীবাবুকে হতাশ হয়ে ফিরতে হল। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কিশোরীবাবুর খোঁজ করতেন, বলতেন "আমার কাছে কেন আসে না?"[১০] সবাই জবাব এড়িয়ে যেত। ক-দিন পরেই কিশোরীবাবুর আকস্মিক মৃত্যু। কবি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় সে-খবর জানলেন। উভয়েই উভয়ের দর্শন-অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু দেখা হল না। প্রকাশনা বিষয়ে কিশোরীবাবুর সঙ্গে যেসব আলোচনার জন্য কবির মন ব্যস্ত হচ্ছিল তা আর বলা হল না।

রোগশয্যায় কাটছিল দিনগুলি। সেবারের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয়ায় তাঁর 'ল্যাবরেটরি' গল্প প্রকাশিত হল। সেদিন যেন কবি একটু ভালো বোধ করছিলেন, তাই রথীন্দ্রনাথ কবির হাতে পত্রিকাটি দেওয়ার পর তাঁর অভিব্যক্তি জানা যায় প্রতিমা দেবীর স্মৃতিচারণায়: "কী আগ্রহ তাঁর গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও তিনি কাগজখানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন। সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রায়ই বলতেন, 'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজম্, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজমই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।"[১১]

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "আর সকলে কী বলছে? একেবারে ছি ছি কাণ্ড তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না! আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে— সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে এটা লেখা ওঁর উচিত হয় নি? ... সোহিনী মানুষটা কীরকম, তার মনের জোর। তার

লয়লটি, এই হ'লো আসলে বড় কথা— তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাৎ— সেইটেই তো বেশি করে দেখিয়েছি।"

'ল্যাবরেটরি' গল্প লেখার পর অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লিখেছিলেন: "দায়ে পড়ে একটা গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম, বহু কষ্টে লিখে নিষ্কৃতি নিয়েছি" (*চিঠিপত্র* ১১, পৃ ৩৪১)। গল্পটি পড়ে কেমন লাগল অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিতে তার প্রতিফলন ভারী চমৎকার: "'পঞ্জাবের নানা জায়গায় ঘোরবার কালে ট্রেনে ব'সে, ল্যাবরেটরি গল্প পড়লাম। মনেও করা যায় না এমন গল্প লেখা যেতে পারে। শুক্‌নো ধুলোর পৃথিবী সম্পূর্ণ মাধুরীতে ভ'রে গেল— ভুলেই গেলাম বাংলার বাহিরে আছি, চতুর্দিকে যুদ্ধ লেগেচে; বুঝতে পারলাম জীবনের সন্ধান কোন্‌খানে। চমৎকৃত কল্পনায়, নিগূঢ় শিল্পে মননে চরিত্রচিত্রে মর্মান্তিক এমন গল্প লেখা হয়নি।"[১২]

ওই রোগশয্যায় অর্ধশায়িত রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা নিলেন তাঁর ছোড়দিদি বর্ণকুমারী দেবীর হাত থেকে। সে-ঘটনার সাক্ষী রানী চন্দ জানিয়েছেন: "'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এল। গুরুদেবের এক দিদিই জীবিত তখন বর্ণকুমারী দেবী। তিনি এলেন আশিবছরের ভাইকে ফোঁটা দিতে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজও ভাসছে চোখের সামনে— গৌরবরন একখানি শীর্ণ হাতের শীর্ণতর আঙুলে চন্দন নিয়ে গুরুদেবের কপালে কাঁপতে কাঁপতে ফোঁটা কেটে দিলেন। দুজন দুপাশ হতে ধরে রেখেছি বর্ণকুমারী দেবীকে। ফোঁটা কেটে তিনি বসলেন বিছানার পাশে

ল্যাবরেটরি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয়ায় প্রকাশিত 'ল্যাবরেটরি' গল্পের অলংকরণ

চেয়ারে। ভাইয়ের বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। খুব রাগ হয়েছে দিদির ভাইয়ের উপরে। কালিম্পঙে গিয়েই তো ভাই অসুস্থ হয়ে এলেন, নয়তো হতেন না— এইভাব দিদির। ভাইকে বকলেন, বললেন, দেখো রবি, তোমার এখন বয়েস হয়েছে, এক জায়গায় বসে থাকবে, অমন ছুটে ছুটে আর পাহাড়ে যাবে না কখনো। বুঝলে?

গুরুদেব আমাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন, না, কক্ষনো আর ছুটে ছুটে যাব না; বসে বসে যাব এবার থেকে।

সকলের খিলখিল হাসিতে ঘর ভরে উঠল।

দিদি যত বলতে লাগলেন, না রবি, যা বলছি শোন, ছুটে ছুটে আর কোথাও যাবে না তুমি। গুরুদেব ততই বলছেন, না, বসে বসেই যাব।

সেদিন দিদির সঙ্গে তাঁর এই কথা রোগশয্যায় যেন উৎসবের আমেজ এনে দিল। গুরুদেব বললেন, দেখি, তোমার পা-দুটি তুলে ধরে উপরে, নয়তো প্রণাম করব কি করে ?

দিদি বললেন, থাক্, এমনিতেই হবে, তোমাকে আর পেন্নাম করতে হবে না কষ্ট করে। ব'লে ভাইকে আরো আরো আদর করে আরো বুঝিয়ে দুপাশে দুজনের হাতে হাতের ভর রেখে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন।"[১৩]

রোগের উপশমের প্রশ্নে কমবয়সি চিকিৎসকরা, বিশেষ করে সার্জনরা সবাই একমত, তখনই অপারেশনটা সেরে ফেলা জরুরি। রথীন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, প্রশান্তচন্দ্র প্রস্তাব দিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকারের মতামতটা জরুরি:

অল্পবয়সী ডাক্তাররা এখন স্যার নীলরতনকে বেশী আমল দিতে চান না; মনে করেন যে, বার্ধক্যে ওঁর আগের সেই প্রতিভা ম্লান হতে বসেছে, কাজেই তাঁর বিচার শক্তির উপর সব সময়ে নির্ভর করা যায় না। উনি বড়ো বেশী সেকেলে মতবাদের লোক ইত্যাদি। তবু আমাদের কাছে তিনি এখনও 'মরা হাতী লাখ টাকা'। অতএব তাঁর ডাক পড়লো। অন্যান্য ডাক্তারদের সব যুক্তি-তর্ক বৃদ্ধ স্থির হয়ে বসে শুনলেন। সকলের বলা হয়ে গেলে স্বভাবসুলভ মিষ্টি গলায় মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন, আপনাদের কথা সবই ঠিক যে, এ অপারেশন খুবই সহজ। অনেকবার অনেক বৃদ্ধের রোগ আপনারা সারিয়েছেন, সামান্য একটা ফোঁড়া কাটার মতো ব্যাপার। সবই মানলাম, কিন্তু আপনারা একটা কথা মনে রাখছেন না যে, রুগী অন্য কোনো লোক নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সর্বসাধারণের মতো ওঁর 'নার্ভাস সিস্টেম' নয়। সুকুমার দেহ ওঁর, কাজেই অন্যলোকের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। খুব ভালো করে সুরে বাঁধা একটা বাদ্যযন্ত্রের মতো। বাইরে থেকে আঘাত করতে গেলে যে ধাক্কা শরীরে লাগবে, তাতে ওঁর সমস্ত দেহযন্ত্রটাই বিকল হয়ে যাবার আশঙ্কা। আমার মনে হয় না এই 'রিস্ক' নেওয়া উচিত হবে। ওষুধ দিয়েই এখন চিকিৎসা হোক না।"[১৪]

সবাই যেন হাঁফ ছেঁড়ে বাঁচলেন।

শান্তিনিকেতনে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন কবি, বেশ কিছুদিন থেকেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মন আর টিকছিল না। অপারেশনের সিদ্ধান্তে ডাক্তাররা সকলে একমত ছিলেন না, বিশেষত সার নীলরতনের মত না-হওয়াতে তখনকার মতো অপারেশন স্থগিত রইল। অবশেষে ১৯ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরলেন।

শেষবার শান্তিনিকেতনের আকাশ ভরা কোলে

বোধকরি অনেকেরই মনে আশা জেগেছিল কবি পূর্ব স্বাস্থ্য অনেকটাই ফিরে পাবেন। প্রতিমা দেবীরও সেই রকমই মনে হয়েছিল, "সেখানকার খোলা হাওয়া, শীতের তাজা ভাব, সমস্তই প্রথম ধাক্কায় তাঁর দেহ-মনকে সজাগ করে তুলল, মনে হল হয়তো একটা আরোগ্য আসবে। হয়তো আবার পূর্বের মতো চলে-ফিরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে।" [১৫]

রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরে উদয়ন বাড়িতে উঠলেন, বাড়িটা বড়ো, রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবী এখানেই থাকেন, তাঁদের

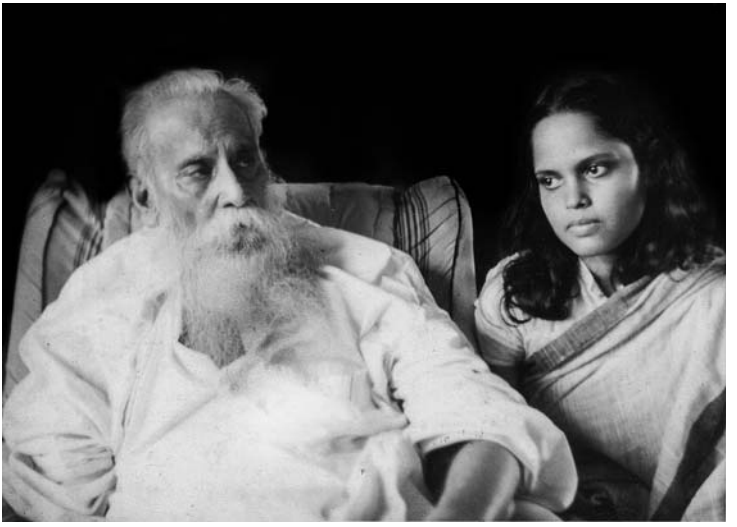

নাতনি বুড়ি (নন্দিতা)-র সঙ্গে কবি

কাছাকাছি থাকাটাও দরকার।এখানে ডাক্তার, সেবক-সেবিকা, পরিচারক সকলেরই জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে।

সুরেন্দ্রনাথ করের ব্যবস্থাপনায় মুখ্যত বিশ্বভারতীর কর্মীরা কবির সেবার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছিলেন, দৌহিত্রী নন্দিতাও ছিলেন সেই দলে। কবি কখনও কখনও বলতেন, 'আমি ছ-মাসের গ্ল্যাক্সো বেবি হয়ে গেছি'।

প্রতিদিন সকালে তাঁকে "দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসিয়ে দেওয়া হত, তখন কিছু-না-কিছু লিখতেন। এই সময় তাঁর মন চাইত সৃষ্টি করতে। ভোরের বেলা নাতনী নন্দিতা এসে মুখহাত ধুইয়ে, চুল আঁচড়ে, চশমা পরিয়ে, বাইরের চৌকিতে না বসিয়ে দিলে তাঁর মনের তৃপ্তি হত না। নাতনী দাদামশায়ের এই মিলনটি বড়ো মিষ্টি লাগল। তিনি কোনোদিন সেইসময়ে সকৌতুকে এই ছড়াটি নন্দিতার উদ্দেশে বলেছিলেন:

ওরে মোর দোস্ত
আজকে সকালবেলা মেজাজটা খোস তো,
একটু সময় নিয়ে কাছে তুই বোস তো,
কেন তুই চলে যাস, করি নাই দোষ তো॥

তাঁকে কফি খাইয়ে নন্দিতা বাড়ি যেত, আসতেন রানী চন্দ। তাঁর লেখা শুরু হত; এইসময় রানীকে তিনি বলে যেতেন, রানী লিখে নিতেন।"[১৬]

দশই ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে এলেন চিনের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাই-চি-তাও-শা। কবির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎ আলোচনার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। সম্ভবত রাষ্ট্রিককর্মে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ-আলোচনা এবং তাই-

চি-তাও-শা-এর অভ্যর্থনার অভিনন্দন পত্রটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই রচনা করেছিলেন। অবশ্য পরের বছর ১৩ মে ত্রিপুরা-রাজের প্রতিনিধিরা তাঁকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদানকল্পে এসেছিলেন। তারও উত্তর-ভাষণে কবি ত্রিপুরারাজের সঙ্গে প্রথম জীবন থেকেই তাঁর আন্তরিক সম্পর্কের কথা বলেন।

মন তো একইভাবে জাগরূক হয়তো পূর্বের মতোই, দেহটাই অসহযোগী। সাতই পৌষের সকাল এল, চিরকালের অভ্যাস মতো আকাশে আলো ফোটবার আগেই মন্দির সমাবেশে এবার আর যোগ দেওয়া হল না। বলা হল না আপন অন্তরে উপলব্ধির কথাগুলি। তাই বলে কি বৃথা যাবে এই বিশেষ দিনের প্রত্যুষলগ্ন। সেদিন সকালে রচিত হল:

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
কারো অপাবৃত
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত॥[১৭]

কয়েকদিন আগেই এইদিন উপলক্ষ্যে তাঁর ভাবনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'আরোগ্য' নামে একটি ভাষণে, মুখে-মুখে যা বলেন রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী তার শ্রুতিলিখন করেন। সাতই পৌষ প্রাতে মন্দির সমাবেশে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সেটি পাঠ করেন। এমন দিনে যে তিনি মন্দিরে অনুপস্থিত, তার কারণ তাঁর বার্ধক্য তাঁর রোগজীর্ণতা। একদিক থেকে সেটা অবশ্যম্ভাবী, অতি পরিণত ফলের উপমা মনে এলো, আসল কথা সে তার ভিতরকার বীজ বা শস্যের আশ্রয় মাত্র। মানুষ যৌবনে তার

বহিরঙ্গ অস্তিত্বকে অনেক বেশি মুল্যবান মনে করে। একসময় তিনিও সেরকমই ভাবতেন। মানুষের বার্ধক্য যে একটা অভাবাত্মক দশা এখন আর তা মনে হয় না। "বস্তুত অল্প বয়সে আমরা সংসারের বহিরঙ্গকেই সম্পূর্ণ মূল্য দিই ব'লেই সংসারে এত অশান্তি ঘটে এবং মিথ্যার সৃষ্টি হতে থাকে। কেননা এই বাহিরের দিকেই আমরা পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন এবং একমাত্র আপনার মধ্যেই আবদ্ধ।"[১৮] অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধি যখনই সম্ভব হয়, সেইদিনই আরোগ্যের দিন।

সেদিন সন্ধ্যার আসরে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে 'মানবিক অভিব্যক্তি' সম্পর্কে তাঁর যে দীর্ঘ আলোচনা হয়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী সেটি লিপিবদ্ধ করেন। মানুষের মধ্যে যে দানবিকতার হিংস্র প্রকাশ তাঁকে নিত্য আলোড়িত করছিল তখন, সেই আলোড়নেই এবারের পঁচিশে ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি নতুন কবিতার সৃষ্টি হল:

প্রচ্ছন্ন পশু

সংগ্রামমদিরাপানে আপনা-বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো দয়ার পাত্র মনুষ্যত্বহারা!
সজ্ঞানে নিষ্ঠুর যারা উন্মত্ত হিংসায়
মানবের মর্মতন্তু ছিন্ন ছিন্ন করে
তারাও মানুষ ব'লে গণ্য হয়ে আছে!
কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে
ঘৃণা ও আতঙ্কে মেশা প্রবল ধিক্কার—
হায় রে নির্লজ্জ ভাষা! হায় রে মানুষ!

কল্যাণীয়
শ্রীযুক্ত অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তী

হে বন্ধু নূতন করে
আরোগ্যের স্বাদ দিলে মোরে
পুরাতন কাল হতে নূতন কী রস
আনি দিল সঙ্গের পরশ।
অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা,
তোমার বুদ্ধির বিচিত্রতা,
ভূয়োদর্শনের তব দান
বন্ধুত্বেরে করে মূল্যবান।
নবোদিত প্রভাতে যেমন
শিখরে শিখরে হয় আলোর এমন পরশন
তেমনি আঁধার গুহা হতে
ফিরে যবে আসি মুক্ত সংসারের স্রোতে
জীবনের সার্থকতা এবে এক নূতন আলোকে
ফিরে আসে চোখে॥

রবীন্দ্রনাথ

৭ই পৌষ
১৩৪৭

ইতিহাস-বিধাতারে ডেকে ডেকে বলি—
প্রচ্ছন্ন পশুর শান্তি আর কত দূরে
নির্বাপিত চিতাগ্নিতে স্তব্ধ ভগ্নস্তূপে!
উদয়ন
২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে [১৯]

'মানবিক অভিব্যক্তি' প্রবন্ধেও এই সবেদন প্রকাশই লক্ষ করি। পাঠকের মনে পড়বে গত বছর রচিত তাঁর গান:

এক দিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ-যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি।
গর্জনে মিশে স্তবমন্ত্রের স্বর,
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় ডাকেন হে ঈশ্বর,
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।
৭ই পৌষ, ১৩৪৬/২০

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত প্রতি বছর সাতই পৌষ তাঁদের গুরুদেবের কাছে নতুন রচনার দাবি নিয়ে উপস্থিত হতেন। সেই দাবিরই ফসল গত বছরের রচনাটি। সে-বছরই সেটি সংগীতে রূপান্তর কালে কয়েকটি স্থানে সংযোজন ও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

এইভাবেই ১৯৪১ সাল এসে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হানাহানি চলছেই, বিদেশি শাসনাধীন ভারতেও যেমন দেশীয় রাজনীতিতে ভেদাভেদের অন্ত নেই তেমন আবার অদৃষ্টের নিষ্ঠুর

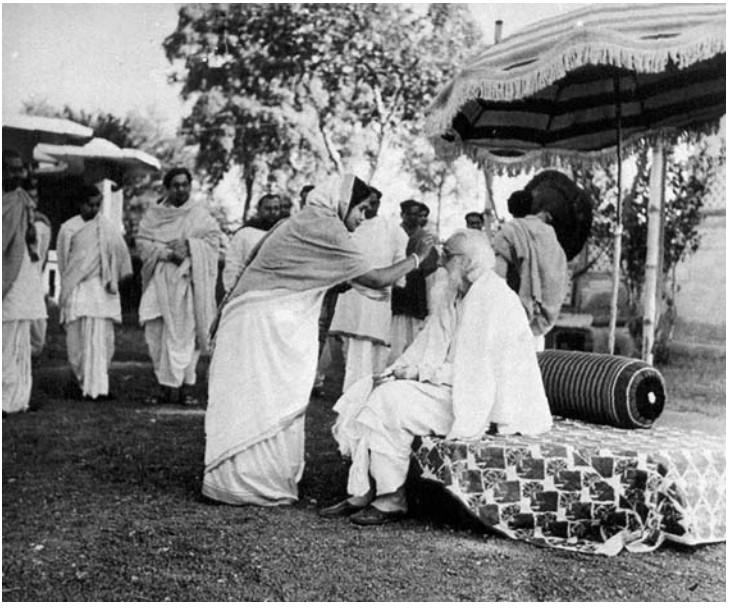

কবিকে বরণ করছেন রানী চন্দ

পরিহাসে দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে থেকেই দাঙ্গা হাঙ্গামা বেঁধে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের একটু যেন উন্নতি কাছের মানুষরা লক্ষ করছেন। সেসময় দুপুরবেলাটায় রানী চন্দ থাকতেন কবির কাছে, তিনি স্মরণ করেছেন: "... কেবল ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়াই আর পাশে চুপটি করে বসে থাকি। গুরুদেবের হাত কি পা কি মাথা যেই একটু নড়ে ওঠে এগিয়ে গিয়ে শুধোই, কিছু কি চাই গুরুদেব? গুরুদেব হয়তো বললেন, কলমটা দে, বা খাতাটা দে, বা চাদরটা এনে পা দুটো ঢেকে দে, শীত করছে; ...। কখনো বলেন, এখন তো আমি অনেক ভালো হয়ে গেছি, বেশি-কিছু তোদের করবার নেই, চুপ করে বসে না থেকে কিছু বরং কর এই সময়টাতে। আমার তাতে ভালোই লাগবে। বই পড়, না হয় কিছু লেখ্।"

রানী মনে-মনে হাসতেন আর ভাবতেন, "লিখব, আমি! এও একটা সম্ভবপর কথা নাকি?"

একদিন যখন গুরুদেব আবার বললেন ওই কথা, রানীর মনে পড়ল, সেবারে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ যখন অসুস্থ, অবনীন্দ্রনাথ রোজ দু-বেলাই তাঁর রবিকার খবর নিতে আসতেন। ঘরে আর ঢোকেন না, বলতেন, "ও বাবা— রুগ্ণ সিংহ বিছানায় পড়ে, ও আমি দেখতে পারবনা।" কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে বিচিত্রায় বসে অবনীন্দ্রনাথ নিজে থেকেই রানীকে অনেক সব পুরানো কথা শোনালেন। যাবার সময় বললেন, "রানী, অনেকে আমায় জিজ্ঞেস করে, কাউকে আমি বলতে পারি নি কিছু। আজ কেমন এসে গেল আপনা হতে। এগুলি মূল্যবান কথা, নষ্ট কোরো

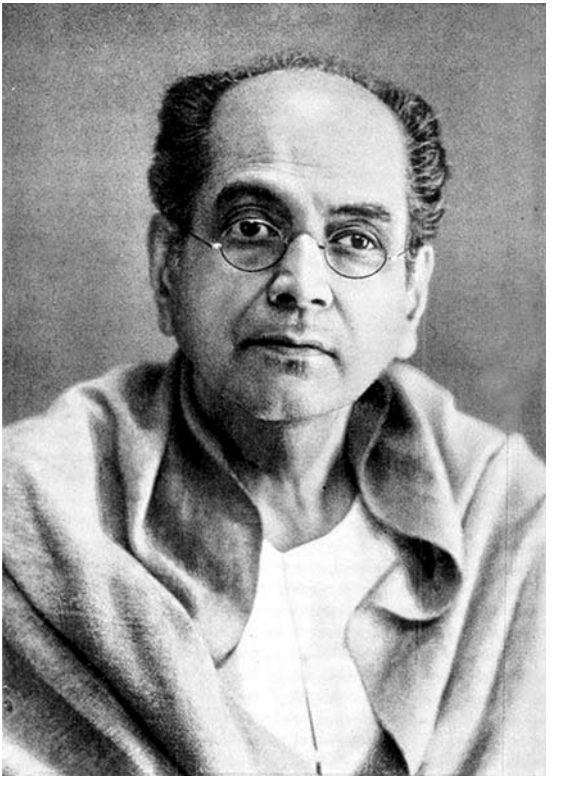

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

না— ধরে রেখো।" রানী ভাবনায় পড়লেন, কথাগুলি কেবলই মনের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে শেষে তাঁর মনে হল, ঠিক যেমন যেমন বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ তেমন করেই তিনি লিখে রাখবেন। তখন কবির কাছে তাঁর শেষরাতের ডিউটি, ঘরের কোণে রাখা নিভু-নিভু লণ্ঠনের আলোয় পরপর কয়েকদিন ধরে লিখলেন।

গুরুদেবকে সেসব কথা জানাতে তিনি বললেন, "লেখাগুলো আছে তোর কাছে?" লেখা এনে দিতে "গুরুদেব পড়তে লাগলেন। দু-তিন পাতা পড়বার পরই দেখি তাঁর কপাল ঘামতে শুরু করেছে। লিখলে কি পড়লে অল্পেতেই এখন গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আমার ভাবনা হল। মনে হল, এই পাতাটা পড়া হলেই বলি, গুরুদেব আর না, বাকিটা কাল পড়বেন। যেই বলতে যাব, অমনি গুরুদেব, পলকে পাতা উলটে অন্য পাতা পড়তে লাগলেন। এমন একমনে পড়ছেন যে, পড়ার মাঝে শব্দ করি এ সাহস হয় না। পাতার পর পাতা এ ভাবেই চলল। থামাবার মতো ফাঁক পাই নে। দেখতে পাচ্ছি গুরুদেবের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কপালের ঘাম বড়ো বড়ো ফোঁটায় ফুটে উঠেছে; ভয়ে ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। একবার তাঁর হাতে-ধরে-রাখা কাগজগুলোর দিকে চাই, একবার মুখের দিকে তাকাই।

যেন এক নিশ্বাসে গুরুদেব সবটা পড়ে ফেললেন। বললেন, এ অপূর্ব হয়েছে, স্পন্‌টেনিয়াস্‌ হয়েছে। অবন বলে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। এতে বদলাবার কিছু নেই। তুই অবনের কাছ থেকে আরো গল্প আদায় করে নে। এমনি করে না বলিয়ে নিলে ও বসে লিখবার ছেলে নয়। ব'লে গুরুদেব ঐ লেখারই একধারে লিখলেন অবনীন্দ্রনাথকে। সে চিঠি অবনীন্দ্রনাথ—

যেমন ছোটো ছেলে রঙিন খেলনা পেলে খপ্ করে নিয়ে মুঠোয় লুকোয়— টুকরো কাগজের চিঠিখানা তেমনি করেই নিয়ে নিলেন। বললেন, রানী, এ চিঠি তোমাকে দেব না। এ যে রবিকা আমায় লিখেছেন— আমার চিঠি।

চিঠিতে লিখেছিলেন, অবন, কোমর বেঁধে বসে লিখবার ছেলে তুমি নও। এ জিনিস তুমি ছাড়া আর-কারো মুখে হবে না, রানীকে তুমি এমনিতরো আরো গল্প দাও।"

কলকাতায় গিয়ে রানী আরও গল্প আনলেন। লেখাও হল। গুরুদেবের পড়াও হল। সে-কাহিনি রানী নিজে আবার বর্ণনা করেছেন: "আমায় দিয়ে বলে পাঠালেন— অবনকে গিয়ে আমার নাম করে বলিস, আমি শুনতে চেয়েছি।

অবনীন্দ্রনাথ খুশিতে উছলে উঠছেন, রবিকা গল্প শুনে খুশি হয়েছেন, আরো শুনতে চাইছেন! বললেন, যত পারো নিয়ে যাও, রবিকাকে গিয়ে শোনাও।

আমি যেন দুজনের স্নেহ-ভালোবাসার বাহন হয়ে গিয়ে-ছিলাম তখন।

জোড়াসাঁকোর ছয় নম্বর বাড়িতে তখন আমি একা। অবনীন্দ্রনাথ রোজ সকালে বিকেলে আসেন পাঁচ নম্বর থেকে, দু তিন চার ঘণ্টা বসে এক-এক বেলা গল্প বলে যান। সারা রাত জেগে সেগুলি আমি লিখে ফেলি, পরদিন ভোরে তাঁকে শোনাই; তারপর আবার নতুন গল্প শুনি। অবনীন্দ্রনাথের মহা আগ্রহ। বলেন, যত পারো নিয়ে যাও, সময় আমারও বড়ো কম। কে জানত রবিকা আমার এই-সব গল্প শুনে এত খুশি হবেন। বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে আসত।

সাতদিনে কতকগুলি গল্প লিখে ফিরে এলাম আশ্রমে। অবনীন্দ্রনাথ বলে দিলেন— এবারকার মতো এই-ই নিয়ে যাও, গিয়ে শোনাও রবিকাকে। ওঁর অসুস্থ শরীরে বেশি উৎসাহ আনন্দ দিতেও ভয় হয়। এই বুঝে লেখা ওঁকে শুনিয়ো। এই গল্পগুলি শুনে রোগশয্যায় যদি উনি মুহূর্তের জন্যও খুশি হন— সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

গুরুদেব তখন উদয়নের দোতলার ঘরে। জানালা দিয়ে দূর দেখতে পাবেন বলে আনা হয়েছে উপরে।

গুরুদেব জানালার ধারে বসেছিলেন সকালবেলা; আমি গল্পগুলি এনে দিলাম হাতে। গুরুদেব পড়তে লাগলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পড়তে পড়তে কোথাও জোরে হেসে উঠলেন, কোথাও-বা ঝরঝর করে দুচোখের জল ঝরে পড়ল, হাতের রুমালে ঘষে ঘষে চোখ মুছলেন। এমন করে গুরুদেবের চোখের জল পড়তে এই প্রথম দেখলাম।

বললেন, আশ্চর্য রূপ দিয়েছে— ছবির পরে ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। সে একটা যুগ— রবিকাকা তার মধ্যে ভাসমান। তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে ওদের সবাইকে। কি সজীব, সব যেন আবর্তিত হচ্ছে। এমনভাবে সেই যুগকে ধরেছে এনে— এ আর কেউ পারবেনা।

গল্পগুলি রোজ কিছুটা করে পড়েন। পরে তুলে রাখি। পরদিন আবার দিই। পড়তে পড়তে গুরুদেব বললেন, দেখ্, এক-একটা যুগের এক-একটা মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। তখন সেই স্বদেশী যুগে চারদিকে কি একটা উন্মত্ততা— বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন। পি. এন.

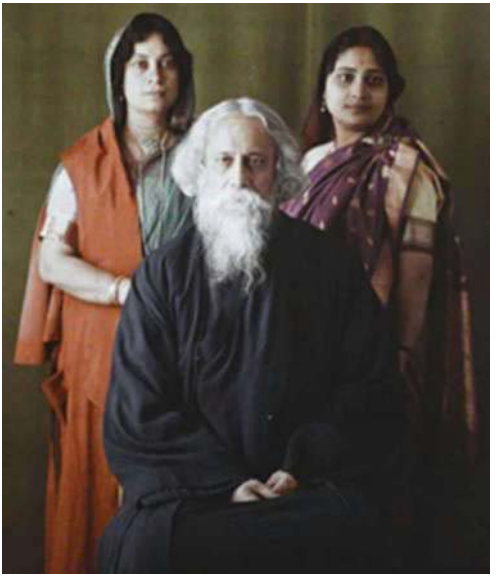

প্রতিমা দেবী ও রানী মহলানবিশের সঙ্গে কবি

বোস বলতেন, ‘রবিবাবু— এ যে হল, হয়ে গেল’, মানে দেশ উদ্ধার হয়ে গেল। বলতুম, হল বৈকি।

তার পর গেল সেই যুগ, গেল সেই উন্মত্ততা। সিরিয়াস হয়ে গেলুম। এখানে চলে এলুম। খোড়ো ঘর, আসবাবপত্র নেই, গরিবের মতো বাস করতে লাগলুম।

কী সুন্দর অবন সেকালের আমাকে তুলে ধরেছে। সবাই ভাবে আমি চিরকাল বাবুয়ানি করেই কাটিয়েছি পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে। কিন্তু কিসের ভিতর দিয়ে যে আমাকে আসতে হয়েছে, এই লেখাগুলোতে তা স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে।

যেদিন পড়া শেষ হয়ে গেল কাগজগুলি সরিয়ে নেব বলে উঠে এগিয়ে এলাম। গুরুদেব কোলের-উপরে-রাখা লেখাগুলির উপর বাঁ হাতখানি চাপা দিয়ে রইলেন।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। গুরুদেব বললেন, রথীকে ডাক।

রথীদাকে ডেকে আনলাম। রথীদা এসে দাঁড়ালেন পিছনে; গুরুদেব বুঝতে পারলেন। লেখার কাগজগুলি হাতে নিয়ে ঘাড়ের পাশ দিয়ে তুলে ধরলেন, বললেন, প্রেসে দাও।

রথীদা লেখাগুলো নিয়ে ফিরে চলে গেলেন।

এই হল ‘ঘরোয়া’ বইয়ের সূত্রপাত।” [২১]

এগারোই মাঘ গুরুদয়াল মল্লিকের পৌরোহিত্যে মন্দির উপাসনা। রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায় সম্পর্কে তাঁর শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন একটি প্রবন্ধে, সেটি পঠিত হয়। সে-প্রবন্ধের একস্থানে তিনি আচার-বিচারের তীব্র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ভারতীয় সমাজের নগ্ন মূর্তি তুলে ধরে রামমোহন সম্পর্কে বলছিলেন:

> আচারের বেড়া গেঁথে যে বহুসংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মূঢ়তা তাদের আত্মাবমাননা সমগ্র দেশের উপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে সুদীর্ঘকাল। অথচ আমাদের যা বিশুদ্ধ, যা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভুরিপরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি— এত বড় কথা বোধ হয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি। আনুষ্ঠানিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঘরে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সত্তা শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দুরবস্থা উপস্থিত। এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতি পদে অস্বীকার করেছেন, নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্যে তিনি নিন্দাভাজন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনো শান্ত হয় নি। এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পুনর্বার তাঁর বাণী স্মরণ করবার সময় এল। তাঁর মহাজীবনের মূল সাধনা কোন্‌খানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে।[২২]

দেশের শোচনীয় দুরবস্থার প্রসঙ্গ সর্বদাই তাঁর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। তবুও ফাল্গুনের দৃশ্যপট কিছু ভিন্ন কথাও মনে আনে। বলেছেন, বসন্তোৎসবের আয়োজন হওয়া চাই, নইলে শান্তিনিকেতনের জীবন ঝিমিয়ে পড়বে যে। আবার উৎসবের আগের দিন ঠিক বিপরীত কথাটাই মনকে নাড়া দিচ্ছে। রানী চন্দকে বললেন, "কাল দোলপূর্ণিমা। বেশি হৈ হৈ করিস নে। কিসের উৎসব। দেশ জুড়ে হাহাকার, ঘরে ঘরে আর্তনাদ, চার দিকে মহামারী— এই কি উৎসবের সময়।"[২৩] সেবারেও আমবাগানে উৎসব যে হল না তা নয়, সেবারকার বসন্তের

কবিতার মধ্যে একটি বিদায়ের করুণ সুর বাজতে লাগল, কতবার ফাল্গুন এসেছে মিলনের বাণী বহন করে তাঁর জীবনে, এবারের মিলন-পাত্রের তলায় রইল বিচ্ছেদের বুদবুদ, পথের হাওয়ার ইঙ্গিতে প্রাণ তাঁর গাইল:

এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।[২৪]

এরই মধ্যে এক টুকরো শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন। শান্তিদেব ঘোষ স্মৃতিচারণ করেছেন:

১৩৪৮ সালের নববর্ষে আমরা নাচ-গান ইত্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত, কারণ গত কয়েক বৎসর ধরে নববর্ষে গুরুদেবের জন্মতিথি পালিত হচ্ছে ও সেই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। দিন তিন-চার পূর্বে সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গিয়েছি, বারান্দায় বসে তাঁকে কিছু গান শোনানোর পর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী এলেন। তাঁকে দেখে নববর্ষের অভিভাষণ 'সভ্যতার সংকট'এর বিষয়বস্তুটি গুরুদেব মুখে বর্ণনা করে গেলেন। অমিয়বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে। লেখাটি কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছিল, বক্তব্য আরম্ভের পূর্বে বললেন যে হয়তো আর বেশি দিন তাঁর এ কথা বলবার সামর্থ্য থাকবে না, এমন-কি আর হয়তো বলবার সুযোগও হবে না, সুতরাং এবারেই তাঁর শেষ বক্তব্য দেশের কাছে বলে চুকিয়ে দেবেন। সমস্ত বক্তব্য-বিষয়টি ধীরে ধীরে বলে গেলেন, আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনলাম শেষ পর্যন্ত।'[২৫]

পয়লা বৈশাখ ভোরবেলায় 'উদয়ন' গৃহের দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কচি শালপাতার আধারে বেল জুঁই কামিনী ফুল ভরে তাঁর হাতে এনে দিলেন রানী, কবির দ্বিতীয়া।

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুর লোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নর লোকে বাজে জয় ডঙ্ক
এল মহা জন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্র দুর্গ তোরণ যত-
ধূলি তলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে বাজে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

নববর্ষ
১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

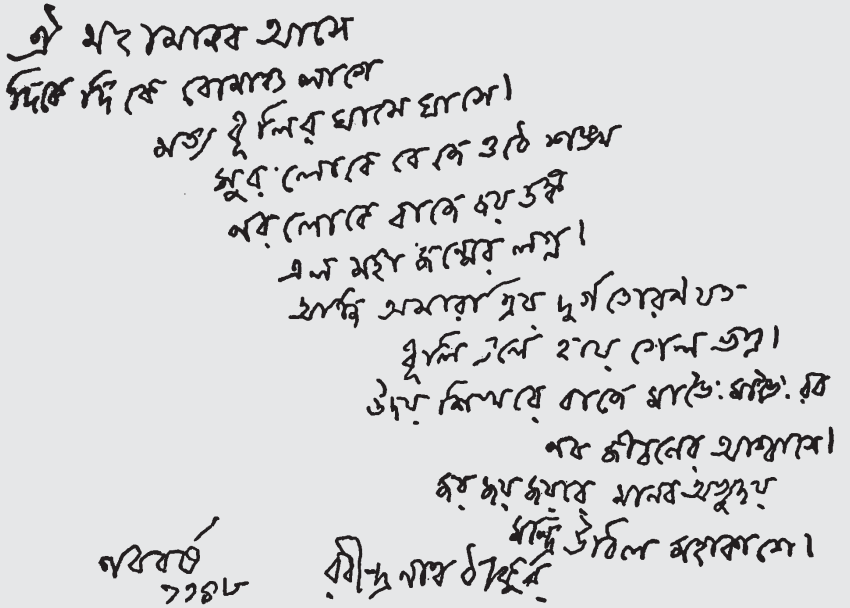

ফুলের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে তা থেকে গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে ধীরে ধীরে কবি বললেন: "আজ আমার জীবনের আশি বছর পূর্ণ হল। আজ দেখছি পিছন ফিরে— কত বোঝা যে জমা হয়েছে; বোঝা বেড়েই চলেছে।"[২৬]

ভোরবেলাকার বারান্দার এই নিরাভরণ দৃশ্য রূপান্তরিত হয়ে যায় বন্ধু ও পরিচিতজনেদের প্রেরিত রাশি-রাশি উপহার-উপচারে। দেশ-বিদেশ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন-বার্তা এসে পৌঁছচ্ছিল। গান্ধিজির তারবার্তায় শুভেচ্ছা-বাণী উচ্চারিত হল: "Four score not enough may you finish five." গান্ধিজির রসময় শুভেচ্ছা বাণীর যোগ্য উত্তর দিলেন রবীন্দ্রনাথও: "Thanks message but four score is impertinence, five score intolerable."[২৭] আশ্রমিকরাও অনেকেই শান্ত পায়ে এসে তাঁদের গুরুদেবকে প্রণাম করে যান, অল্পস্বল্প কথাবার্তা, কুশল বিনিময়। এবারে রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে *জন্মদিনে*।

উত্তরায়ণের বারান্দায় ছিল সন্ধ্যাবেলার অনুষ্ঠান। নন্দিতা দাদামশায়কে সাজিয়ে দিলেন শুভ্র গরদের ধুতি-উত্তরীয় ও মাল্যচন্দনে। ঠেলাগাড়ি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল সভাস্থলে। আশ্রমিক ও অভ্যাগতদের উৎসুক সমাবেশ। কবিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে, মাঙ্গলিক আচার পালন এবং ক্ষিতিমোহন সেনের বেদ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। গীত হয় কবির নব রচিত গান 'ওই মহামানব আসে'। কবি নিজেও উপস্থিত সকলের উদ্দেশে আপন অন্তরের কথা ব্যক্ত করেন। পরে ক্ষিতিমোহন সেন 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান। ওইদিনই

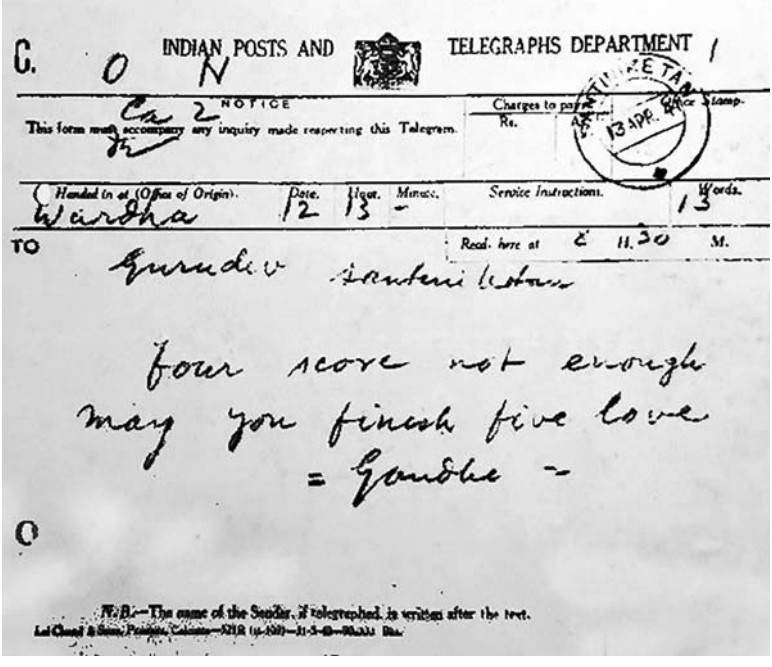

C. O N INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

NOTICE

This form must accompany any inquiry made respecting this Telegram.

Charges to pay Rs. Office Stamp. 13 APR.

Handed in at (Office of Origin). Wardha Date. 12 Hour. 13 Minute. – Service Instructions. Words. 13

Recd. here at 11.30 M.

TO Gurudev Santiniketan

four score not enough
may you finish five love
= Gandhi –

N.B.—The name of the Sender, if telegraphed, is written after the text.

গান্ধিজির শুভেচ্ছা বার্তা

প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ও সেটি সভাস্থজনের মধ্যে বিতরিত হয়। সবশেষে ছিল নৃত্যগীতের একটি অনুষ্ঠান।

পরেরদিন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে তাঁর স্ত্রী রানী যে চিঠি লেখেন সেটি খুব প্রাসঙ্গিক:

> কাল সভা খুব সার্থক হয়েছে। আরম্ভ হতে সাতটা বাজল। কবি সেই রাত নটা পর্যন্ত সমানে বসে রইলেন, অনেক বলা সত্ত্বেও কিছুতেই উঠলেন না। ক্ষিতিমোহনবাবু কবির লেখা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটা পড়বার আগে কবি নিজে যারা ওঁকে অভিনন্দন দিল সবাইকে উদ্দেশ্য করে মুখে একটু বললেন। সমাগত সকলকে আর্শীবাদের ছলে চমৎকার বললেন। মনে হ'ল যেন অসুখ হবার আগেকার মানুষ। বলার মধ্যে কোনো প্রয়াস নেই, কথার জন্যে হাতড়ানো নেই, কোনোখানে থামা নেই, ক্লান্তি নেই কিচ্ছু নেই। গলা বেশ অনেক দূর থেকেও আমরা পরিষ্কার শুনতে পেলাম। কি রকম moved হয়ে বললেন, খুব ভালো বলা হয়েছে।[২৮]

দেখতে-দেখতে তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশে বৈশাখ কাছে এল। কয়েকদিন আগে শান্তিদেব তাঁর কাছে এসেছিলেন নতুন গানের দাবি নিয়ে। একটু দ্বিধা যে ছিল না তা নয়, তবু শেষ পর্যন্ত *পুরবী* কাব্যের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতার শেষাংশ বেছে নিয়ে তা-তে সুরারোপ করলেন। বোধকরি কবি শেষবারের মতো উচ্চারণ করলেন 'রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন'। শান্তিদেব লিখছেন, "'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির 'হে নূতন দেখা দিক আরবার' অংশটি একটু অদলবদল করে সুর যোজনা করলেন। সেদিন ২৩ বৈশাখ। পরের দিন সকালে পুনরায় গানটি আমার গলায় শুনে বললেন, 'হাঁ এবার হয়েছে'।"[২৯]

‘সভ্যতার সংকট’ পাঠরত ক্ষিতিমোহন সেন
আলোকচিত্র: শম্ভু সাহা

রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন জন্মোৎসব নববর্ষের দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবার পঁচিশে বৈশাখে তাঁর জন্মদিনটিও অনাড়ম্বর ঘরোয়াভাবে পালিত হল। নাচ-গান, 'বশীকরণ' অভিনয় ইত্যাদি মিলিয়ে বেশ আনন্দময় পরিবেশ, যেমন সেকালের শান্তিনিকেতনে হত। শরীর যেমনই হোক, কবিও বসে-বসে প্রথম থেকে সব অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ করলেন।

লেখা পড়তে-পড়তে মনে হয় বুদ্ধদেব বসু ঘরোয়াভাবে না হোক বিভিন্ন সভায় বক্তৃতারত রবীন্দ্রনাথকে অনেকবারই দেখেছেন। এবারেও তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ হল, তাঁর কথা শোনবারও। পঁচিশে বৈশাখের ক-দিন পরে সপরিবারে তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে, প্রথম সন্ধ্যায় অল্পক্ষণের দেখা সন্ধ্যার অস্পষ্টতায়। পরের দিন সকালে যখন গেলেন, কবি তখন বসে ছিলেন দক্ষিণের ঢাকা বারান্দায়, পরনে হলদে কাপড় সাদা জামা, পাশে একটা থালায় স্তূপাকার বেলফুল। দেখে মনে হল, "মুখ তাঁর শীর্ণ, আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে-কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামতো তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনো অম্লান। মনে হ'লো তাঁর চোখের সেই মর্মভেদী তীক্ষ্ণ ভাবটা আর নেই, তিনি যখন কারো দিকে তাকান সে-চাহনি স্নিগ্ধকোমল। এই জন্যে তাঁকে মোগল বাদশাহের মতো আর লাগে না, বরং অশীতিপর টলস্টয়ের ছবির সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে

থাকতে হয়, যেমন ক'রে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথও কখনো ছিলেন না, এর জন্যে এই বয়সের ভার আর রোগদুঃখভোগের প্রয়োজন ছিল। বারনাড শ একবার এলেন কেরি-র জন্মদিনে একটি পদ্য লেখেন, তাঁর বলবার কথটা ছিলো এইরকম যে এ কী আশ্চর্য কাণ্ড বছর-বছর আমাদের বয়স বাড়ে আর এলেনের বয়স ক'মে যায়! বয়স যত বেড়েছে রবীন্দ্রনাথ ততই সুন্দর হয়েছেন...'

তাঁর কথা শুনে যখন বেরিয়ে আসতুম, রোজই নতুন ক'রে মনে হতো যে সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে গেল। তাঁর কথা যেন বর্ণাঢ্য গীতিনিস্বন, যেন সুরস্রাবী ইন্দ্রধনু। তা যেমন শ্রুতিসুখকর তেমনি মনোবিমোহন। ...একদিন ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। এ-বিষয়ে তাঁর মুখে কিছু শুনবো, এর বেশি আশা ছিল না। পরদিন সকালে যেতেই বললেন, 'কী কতগুলো বরঠকানো প্রশ্ন করেছো! এই নাও।' হাতে দিলেন শ্রীমতী রানী চন্দের হস্ত লিখিত প্রবন্ধ, তাঁর ঘুম ভাঙার পর শুরু করেছিলেন, আমাদের ঘুম ভাঙার আগে শেষ হ'য়ে গেছে।"[৩০]

মাসখানেক পরে ইংল্যান্ড পার্লামেন্টের সদস্যা ইলিনর রাথবোন এক খোলা চিঠিতে ভারতীয়দের উদ্দেশে তীব্র অবজ্ঞায় উচ্চারণ করেন যে, তাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁর দেশ যুদ্ধে জার্মান নাৎসিদের মোকাবিলা করতে সক্ষম। 'যাঁদের চিন্তাধারা আপনাদের থেকে ভিন্ন তাঁদের সাহায্য আমরা পাচ্ছি।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত অসুস্থ কিন্তু এই অপমানকর চিঠি তাঁকে ভয়ানক বিচলিত করে তুলল। ভারতবাসীর হয়ে যে

প্রত্যুত্তর রবীন্দ্রনাথ দিলেন সেটি ৫ জুন ১৯৪১ আমাদের দেশের সব দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। প্রায় তেত্রিশ বছর পরে এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কৃপালনি সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রশ্নের উত্তরে যা লিখেছিলেন, সেটি মুল্যবান:

> Yes, gurudev's reply to Miss Rathbone's letter was drafted by me. He was very excited when he read her 'open letter' but was too weak to write a reply himself. So he sent for me and told me what he thought of it and asked me to draft a reply for him. I read out what I drafted and he accepted it without changing anything, as far as I recollect. I should not be surprised if the original draft in my hand is found lying among Rabindra Bhavana archives.[৩২]

পত্রিকায় প্রকাশিত মিস রাথবোনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের খোলা চিঠি পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হল। পত্রিকায় সে চিঠি পড়ে সম্ভবত বহু জনেই আপন আপন প্রতিক্রিয়া জানিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বসু ৭ জুন কবিকে লিখলেন:

> ইতিমধ্যে Miss Rathbone-এর প্রগলভতার আপনি যে উত্তর দিয়েছেন তা প'ড়ে মুগ্ধ হলাম। এই মূক, অবনমিত, উৎপীড়িত দেশের আপনিই মুখপত্র, কোটি-কোটি ভারতবাসীর তরফ থেকে আপনিই বক্তা। আমাদের আপমানের তো অন্ত নেই— এরই মধ্যে আমাদের আত্মমর্যাদা জাগ্রত ও অক্ষুণ্ণ রাখবার আপনার যে-আজীবন সাধনা তা ব্যর্থ হবার নয়।[৩৩]

দেখতে-দেখতে বর্ষা এসে গেল। চিরকালের মতোই খোলা আকাশে বর্ষার রূপ দেখবার জন্য কবির মন উতলা। তাই তাঁকে উত্তরায়ণের দোতলায় স্থানান্তরিত করা হল। সে-ব্যাপারে অবশ্য

উত্তরায়ন, শান্তিনিকেতন

তাঁর আপত্তি ছিল বেশ, অনেক বুঝিয়ে ওপরে নিয়ে আসা হল। দোতলার বারান্দায় বসে বসে সেবারেও শান্তিনিকেতনের বর্ষা নির্নিমেষ চোখে দেখতেন। অসুখ কিন্তু বেড়েই চলেছে, রোজ জ্বর আসে, তিনি বুঝতে পারেন তাঁর শরীরের অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে চলেছে। তাঁর তীক্ষ্ণ বোধশক্তি তখন ধীরে-ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, কানে খুবই কম শুনতে পেতেন, চেঁচিয়ে কথা বলতে হত। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল, অতি ধীরে একটি-একটি করে অক্ষর লিখতেন। তিনি একটু আনন্দ পাবেন বলে অনেক সময় শান্তিদেব ঘোষেরা গান শোনাতে আসতেন কিন্তু সকল সুর আর তাঁর কানে পৌঁছত না, তাই তিনি গান শেষ হলে গভীর নৈরাশ্যের সুরে বলতেন, "আমার কানে সব নোট স্পর্শ করে না।" আর একদিন বর্ষা শুরুর পর তিনি প্রতিমা দেবীকে বললেন, "মা-মণি, আমি ক্রমশই নেমে যাচ্ছি, বুঝতে পারছি এ ব্যামোর হাত এড়াতে পারব না। আমার নিবে-যাবার সময় এসেছে, আর কেন এ রোগযন্ত্রণা ভোগ। আমার কাজ চুকেছে। তোমরা সংসার গুছিয়ে বসেছ, আমি নিশ্চিন্ত, আর রইল এই ল্যাবরেটরি (শান্তিনিকেতন), একে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো। এর ভার রইল তোমাদেরই উপর।" [৩৪]

এই সময় কিছুদিন কবিরাজি চিকিৎসা শুরু হয়েছিল কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের অধীনে। সে অবশ্য খুব বেশি দিনের জন্য নয়। রানী মহলানবিশ এই সময় বেশ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কবির কাছে ছিলেন, কবিরাজি চিকিৎসাপর্বের বেশ একটু বিস্তৃত বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই চিকিৎসার জন্য খুব বেশি সময় দেওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে যে ডাক্তাররা কয়েকবারই

শান্তিনিকেতন এসেছেন এবং কবিকে পরীক্ষা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, অপারেশন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কবিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া স্থির হল।

কলকাতার চিকিৎসক দলে ছিলেন ইন্দুভূষণ বসু, বিধানচন্দ্র রায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্যোতিপ্রকাশ সরকার— তাঁরা স্থির করলেন, শ্রাবণেই অপারেশন হবে। কয়েকদিন পরে ডাক্তার রাম অধিকারী, জিতেন্দ্র দত্ত প্রমুখ এসে অপারেশনের সিদ্ধান্তে একমত হন। এঁদের অনেকেই তখন রবীন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করার জন্য প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আসতেন। কবির মন চেয়েছিল, সময় হলে যেমন ফুল পাতা আপনা হতেই খসে পড়ে, বৃদ্ধ জীর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়, তিনিও প্রকৃতির কোলে সেভাবেই একদিন ঢলে পড়বেন।

> আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
> শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
> ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
> আপনারে দিতেছে বিস্তারি
> আমার সকল-কিছু-মাঝে।[৩৫]

মন যা চেয়েছিল চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত তার বিপরীত, তবু তা বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিলেন। কলকাতায় যাওয়ার আয়োজন প্রস্তুত, এই সময়ে প্রতিমা দেবী হঠাৎই প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী, তাঁকে বাদ দিয়েই যেতে হল।

রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতন— সেই অচ্ছেদ্য বন্ধন এবার টুটল। কতদিন আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয় না, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু প্রমুখ আচার্যেরা প্রায় আর আসেনই না তাঁর কাছে, পাছে অসুস্থ কবির ক্লান্তি বাড়ে। আজ সকালে কবির যাত্রালগ্নে সকলেই এসেছেন, ছেলেমেয়েরা উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে সমস্বরে গাইছিল ‘এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার’, গাড়ি চলছে আশ্রমের ভিতর দিয়ে, ভেসে আসছে সমবেত কণ্ঠে ‘আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব

রওনা হচ্ছেন কলকাতার পথে

হতে আপন'। "কবি স্ট্রেচারের হাতলের উপরে ভর করে গালের নিচে হাত দিয়ে চশমা চোখে আধশোয়া হয়ে আশ্রমের চারিদিক দেখতে দেখতে চলেছেন ... অনেক দিন ঘর থেকে বেরোন নি, আশ্রমের চেহারাও তিনি দেখেন নি।"[৩৬] আশ্রমের এলাকা পার হয়ে চলেছেন তাঁর যাত্রা পথের দু-পাশে গ্রামবাসীরা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁকে শেষ বিদায় জানাল।

বোলপুর স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন রেলের উচ্চপদস্থ কর্তা নিবারণচন্দ্র ঘোষ, তাঁর নিজস্ব সেলুনটিতে কবিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা তিনি করেছেন। কবিকে সেলুনে তোলা হল। সেলুনে একটা বসবার কামরা আর তার পাশে শোবার ঘর। প্রথমে কবি বসবার ঘরের চেয়ারে বসেই জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। "অজয় নদী পার হবার সময় বুড়ী বলল—দাদামশাই, অজয় পার হচ্ছ। বললেন 'কতদিন পর দেখলুম নদীটাকে'।"[৩৭] শান্তিনিকেতন থেকে হাওড়া স্টেশন মোটামুটি ভালোই কেটেছিল বলা চলে, সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, বরং হাসি-তামাশায় তাঁদেরই মাতিয়ে রেখেছিলেন। ওইদিন যে অসুস্থ কবিকে কলকাতায় আনা হচ্ছে সেকথা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশদের বিচক্ষণতায় শহরবাসীদের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। নিউ থিয়েটার্সের একটি বাস স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। সেই বাসে কবিকে নিয়ে সকলে নির্বিঘ্নে জোড়াসাঁকোয় পৌঁছলেন। কবি আবার তাঁর সেই পাথরের ঘরের শয্যায় আশ্রয় নিলেন। তখনও সবার সঙ্গে কথাবার্তায় যেন বেশ ছিলেন। সেদিন রাত্রে স্ট্রেচার থেকে কবিকে খাটে শোয়ানো হল, সারারাত বেশ ভালোই ঘুমোলেন। পরেরদিন সকালেও খুশিতেই ছিলেন,

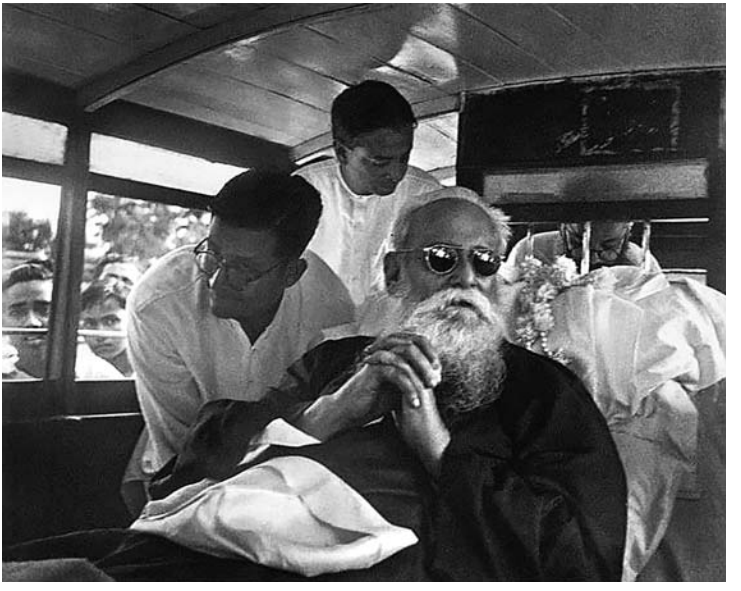

কলকাতার পথে

ক্লান্তির ভারও যেন তত নয়। উপস্থিত সবার সঙ্গে অনেক কথাও বলছিলেন। সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকেই দেখা করতে এলেন। আগের দিন অবনীন্দ্রনাথ অসুস্থ খুড়োকে দরজা থেকে একটু দেখেই চলে গিয়েছিলেন। আজ কবিকে দেখে তিনি খুব খুশি। হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকলেন।

ঘরোয়া-র গল্প নিয়েই তাঁকে রবিকা বললেন, "অবন, আজকের দিনে আমাকে এমন রূপ দেওয়া— এ আর কারো দ্বারা সম্ভব হত না। সবাই আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে। আমাকে স্তুতি করতে গিয়ে আসল আমাকে ধরতে পারে নি। তোমার মুখ দিয়ে এতদিনে সবাই জানবে তোমাদের রবিকাকাকে।"

সে-যুগের নানা গল্প হতে-হতে খুড়ো-ভাইপো জমে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার মনে আছে রবিকাকা, সেই গল্প— চার দিকে ঝমাঝম বৃষ্টি, মালগাড়ির নীচে বসে কুলি-মজুরদের নিয়ে মিটিং করা হচ্ছে— এমন সময়ে এঞ্জিন এসে গাড়ি টানতে শুরু করলে।"

তাঁদের হাসিতে ঘর ভরে উঠল।

গুরুদেব বললেন, "তোমার মনে আছে অবন, খবর পেয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে চাঁদা তুলতে গেলুম? অন্ধকার সিঁড়ি। অতিকষ্টে উপরে উঠে দেখি একটা ছোটো ঘরে একটা ছোটো কাঠের বাক্সের সামনে এক ভদ্রলোক বসে। আমাদের দলবল দেখে তখুনি পাঁচশো টাকা দিয়ে আমাদের বিদায় করে দিয়ে যেন বাঁচলেন। কেন টাকা দিলেন, কাকে টাকা দিলেন, সে সবের খোঁজ নেবারও দরকার মনে করলেন না!"

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনে হাসতেই থাকেন। এ সময় তাঁদের মুখের ভাব আর গলার সুরে কে বলবে যে, আশি বছরের খুড়ো আর সত্তর বছরের ভাইপো গল্প করছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মজয়ন্তী দেশে যথোপযুক্ত মর্যাদায় পালিত হোক তা ছিল রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা। অথচ অবনীন্দ্রনাথ রাজি হচ্ছিলেন না। নন্দলাল বসুও বলতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "অবন, তোমার এতে আপত্তির মানে কি? দেশের লোক যদি চায় কিছু করতে, তোমার তো তাতে হাত নেই।" অবনীন্দ্রনাথ শেষে বাধ্য ছেলের মতো বললেন, "তা আদেশ যখন করছ, মালা চন্দন পরব ফোঁটানাটা কাটব, তবে কোথাও যেতে পারব না কিন্তু।" একথা ব'লেই অবনীন্দ্রনাথ গুরুদেবকে প্রণাম করে পড়ি-কি-মরি একরকম ছুটেই সে ঘর ছেড়ে পালালেন।[৩৮]

বিকেলবেলায় গ্লুকোজ় ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়ায় যখন 'রাইগার' শুরু হল, সকলেই বিব্রত। উপস্থিত ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় জানালেন, গ্লুকোজের রিয়্যাকশানে অনেক সময় এরকম হয়, কিছুক্ষণ পরে থেমে যাবে। খানিক পরে কাঁপুনি থামল, বেশ জ্বরও এসে গেল। রাতটা একটানা ঘুমের মধ্যেই কেটে গেল।

সাতশের সকালে কবি নতুন একটা কবিতা মুখে-মুখে বলে গেলেন:

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।

মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর॥

রানীকে বললেন, "সকালবেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে কয়েক লাইন— লিখে রাখ, নয়তো হারিয়ে ফেলব। প্রত্যেক বারই ভাবি ঝুলি খালি হয়ে গেল— এবারে চুপচাপ থাকি; পারি নে। এ পাগলামি নয়তো কি?

কবিতার কয়েকটা জায়গায় বলে বলে কাটাকুটি করালেন। ফিরে আর-একটা কাগজে তা লিখে দিলাম গুরুদেবকে। গুরুদেব শুয়ে শুয়েই বুকের উপরে কবিতার কাগজটি ধরে আরো তিন জায়গায় নিজের হাতে কেটে অন্য কথা বসালেন।"[৩৯]

পরে তাঁর প্রথমাকে কাছে পেয়ে আজ সকালেও যে একটা কবিতা রচনা হয়েছে সে কথাটা অভ্যাসমত সরস করেই তাঁকেও জানালেন, "জানো, আজও আর একটা কবিতা হয়েছে সকালে। এ কী পাগলামি বল তো? প্রত্যেকবারই ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু তারপর দেখি আবার একটা বেরোয়। এ লোকটাকে নিয়ে কি করা যাবে।"

আগের দিন বিকেলের গ্লুকোজ় ইনজেকশনের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, অত কাঁপুনি দেখে সকলেই ব্যতিব্যস্ত। কবি কিন্তু তার কার্যকারণটা ভিতরে ভিতরে অনুভব করেছিলেন

কবিতা রচনার কথার শেষে সে-কথাটিও জানালেন, "কাল কি কাণ্ডটা হল? বাবাঃ, কী কাঁপুনি! এটা ঐ খোঁচাটার জন্যেই হল, কেমন? তাই না? আমি তখনই বুঝেছিলাম যে ঐ খোঁচাটার জন্যেই কাঁপুনি এসেছে, কিন্তু কাউকে কিছু বলি নি। এঁরা কেউ কেউ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, হঠাৎ কি কারণে যেন জ্বর এসে গেল। আরে, আমি কি এত বোকা? কিন্তু মজা দেখো, আজ আবার কেমন ঠিক হয়ে গিয়েছি। আঃ, ব্যপারটা চুকে গেলে বাঁচি; তাহলে রোজ রোজ এই ক্ষুদে ক্ষুদে খোঁচাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।"[৪০]

পরদিন আটাশে জুলাই হয়তো একইরকম ছিলেন। ঊনত্রিশের বিবরণে দেখা যায় ডাক্তার জ্যোতিপ্রকাশ সরকারকে যেন সবচেয়ে অন্তরঙ্গ জেনে তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইছেন, অপারেশনের দিন কবে স্থির হল, কবি শুনেছেন, অস্ত্রোপচারের সময় তাঁকে অজ্ঞান করা হবে না, লোকাল এনাসথেটিকস দিয়ে করা হবে; তা-তে নাকি বিপদের সম্ভাবনা কম, কারণ পরে নিউমোনিয়া ইত্যাদি হবার ভয় থাকবে না। সেইজন্যেই বারবার মনে প্রশ্ন জাগছে, ঠিক কতখানি লাগবে। জানতে চান, "আচ্ছা জ্যোতি, আমাকে বুঝিয়ে বল তো— এই ব্যাপারে আমার কতদূর কি লাগবে। আমি সব বুঝে রাখতে চাই আগে থেকেই।" বলা বাহুল্য ডাঃ সরকার এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান, সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তেমন কিছুই লাগবে না তাঁর, "এমনও হতে পারে যে, অপারেশান-টেবিলে এক দিকে অপারেশন হচ্ছে আর-এক দিকে আপনি কবিতা বলে যাচ্ছেন।"[৪১]

এদিনও নতুন একটা কবিতা মুখে মুখে বলেন রানী চন্দ লিখে নিলেন। রানীর লেখা সবটা পচ্ছন্দ হচ্ছে না, বকুনিও দিলেন একটু— "এ কি লিখেছ তুমি? ছন্দ মিলল কোথায়?" ওই প্রসঙ্গে কথা হতে-হতে বললেন, "এ ভাবে তোমাকে দিয়ে কবিতা লেখালে তুমিই কোনো দিন কবিতা লিখতে শুরু করে দেবে। এখন তোমাকে আমি খাটাচ্ছি, তখন আমাকেই তুমি খাটিয়ে নেবে।"[৪২]

তিরিশের সকাল। কবি চুপ করে আছেন দেখে রানীর মনে হল, কিছু ভাবছেন, কাগজ কলম নিয়ে কাছে বসতে একটু পরে ইশারা করলেন— লেখো। ধীরে-ধীরে বলতে লাগলেন:

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে ।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।

রানী লিখেছেন, গুরুদেব, ক্লান্ত বোধ করছিলেন, চুপ করে রইলেন বেশ খানিকক্ষণ, অবশেষে নির্মীয়মাণ কবিতাটির শেষ তিনটি ছত্র দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হল:

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সইতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে আসবার আগে প্রতিমা দেবী প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। বেলা দশটা নাগাদ বউমার উদ্দেশে একটি চিঠি লেখালেন:

মামণি,
তোমাকে নিজের হাতে লিখতে পারি নে বলে কিছুতে লিখতে রুচি হয় না। কেবল খবর নিই আর কল্পনা করি যে তুমি ভালো আছ— অন্তত এখানকার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভিতর থেকে দূরে থেকে কিছু আরামে আছ। কিছু তাপ এখনও তোমার শরীরে আছে সেটা ভালো লাগছে না। কেননা ক্ষুদ্র শত্রুর জেদটাই সবচেয়ে দুঃখজনক। আমাকে প্রত্যহই একটা-না-একটা খোঁচা দিচ্ছেই— বড়ো খোঁচার ভূমিকা স্বরূপে। শুনেছি বড়োর আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয়। এই-সব ছোটো ছোটো উপদ্রব যেমন।— যা হোক এরও তো অবসান আছে এবং তারও খুব বেশি দেরি নেই। চুকে গেলে নিশ্চিন্ত থাকব। ইতি— [৪৪]

চিঠি লেখা শেষ হলে কবির হাতে দিতেই তিনি কাঁপা হাতে লিখে দিলেন 'বাবামশায়'। অক্ষরগুলো গায়ে-গায়ে লেগে অস্পষ্ট হল, রেখে গেলেন কালিকলমের শেষ স্পর্শ।

কবি তখনও জানতেন না যে সেইদিনই তাঁর অপারেশন। ললিতবাবু অপারেশনের সব কিছু গোছগাছ করে এসে রবীন্দ্রনাথকে বললেন, "আজ দিনটা ভালো আছে। তা হলে আজই সেরে ফেলি— কি বলেন?" একথা বলে তিনি বাইরে আকাশের দিকে চাইলেন। যেন ঝকঝকে দিন দেখে এই মুহূর্তেই কথাটা মনে এল তাঁর। কবি একটু হকচকিয়ে বললেন, "আজই?" তারপর উপস্থিত সকলকেই যেন জানালেন, "তা ভালো, এরকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তাঁর দ্বিতীয়াকে সেদিনের লেখাটা পড়ে শোনাতে বললেন, শুনে বললেন, "কিছু গোলমাল আছে— তা থাক্, ডাক্তাররা তো বলছে অপারেশনের পরে মাথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে; ভালো হয়ে পরে ঠিক করব'খন।"[৪৫]

সকাল থেকে প্রায় নিঃশব্দে রবীন্দ্রনাথের ঘরের পুব দিকের বারান্দা ধুয়েমুছে অপারেশনের যাবতীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হচ্ছিল। বেলা এগারটা নাগাদ ওঁকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে অপারেশন টেবিলে শোয়ানো হল। তাঁকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয়নি অপারেশনের জন্য লোকাল এনেস্থেসিয়া ব্যবহার করা হয়। অপারেশন প্রক্রিয়া তাঁর দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য বুকের ওপর দিয়ে একটা পর্দা টাঙানো হয়েছিল। অপারেশন চলাকালে বারান্দার উত্তরদিকটায় সকলেই অপেক্ষা করছিলেন, সকলেই

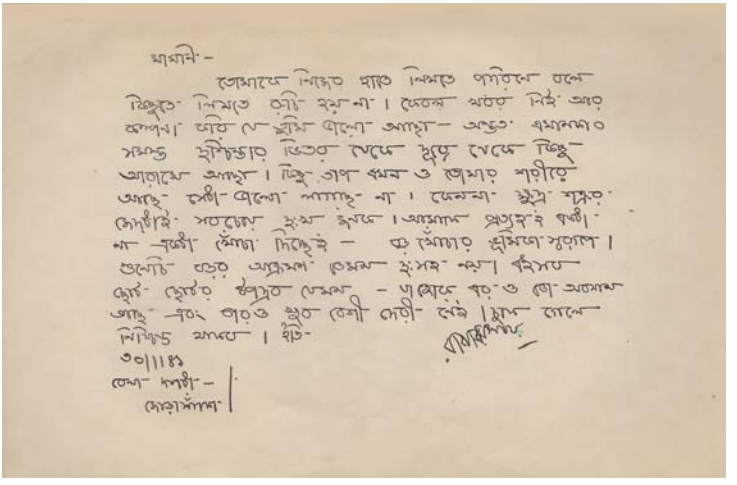

প্রতিমা দেবীকে লেখা কবির শেষ স্বাক্ষরিত চিঠি

উদ্বিগ্ন। কোথাও একটি ছুঁচ পড়লে যেন সে আওয়াজ কানে লাগবে এমনি ভাব সবার। জানা যায় অপারেশন সম্পূর্ণ হতে আধঘণ্টার মতো সময় লেগেছিল, আসল অপারেশন—প্রস্টেট কাটা নয়, শুধু একটা জায়গা ফুটো করে ইউরিন বেরোনোর রাস্তা করে দেওয়া। ডাক্তারিশাস্ত্রে যাকে বলে সুপ্রা পিউবিক সিস্টোস্কপি। [৪৬]

বেলা বারোটা নাগাদ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের ঘরে এনে বিছানায় শোয়ান হল। সজ্ঞানেই আছেন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সস্ত্রীক কাছে এসে দাঁড়াতে বেশ বিরক্ত মুখে বললেন, "জ্যোতি মিথ্যে কথা বলেছে। কেন বলেছিল যে, কিচ্ছু লাগবে না। আমার খুব লেগেছে— এত কষ্ট হচ্ছিল যে আমি জোর করে ঠোঁট টিপে চোখ বুজে পড়ে রইলুম— পাছে আমার মুখ দিয়ে কোনোরকম আর্তনাদ বেরিয়ে যায়।" [৪৭]

সন্ধে সাতটার সময়ে ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এসে জানতে চাইলেন, "অপারেশনের সময় কি লেগেছিল আপনার?" স্পষ্ট করে না-বললেও যা বললেন তা-তে অস্পষ্টতা কিছু রইল না, "কেন মিছে-মিথ্যে কথাটা বলাবে আমাকে দিয়ে।" ললিতবাবু বললেন, "তা এক রকম সব তো ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল, কেবল জ্যোতির দুঃখ রয়ে গেল আপনার কবিতাই বলা হল না।"

সেই সুত্র ধরেই হয়তো আগের দিন লেখা কবিতাটি আর একবার শুনতে চাইলেন, শুনে বললেন, "ঠিক আছে, এটাই ঠিক হবে। লিখে জ্যোতিকে দে।"

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;

একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার॥

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হারজিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥[৪৮]

রানীর মনে পড়ল কবিতাটি রচনার পর, গুরুদেব আপন মনেই বলেছিলেন, "ভয়কে ভয় করলেই ভয়।"

আদেশ পালিত হল। রানী চন্দ কবিতাটি অন্য কাগজে লিখে যে-ঘরে সকলে বসে ছিলেন সেখানে গিয়ে ডাক্তার জ্যোতিপ্রকাশ সরকারের হাতে দিলেন। সে-কবিতা তখনই রচিত হয়েছে মনে করে সবাই হৈ-হৈ করে উঠলেন। সে-রাত্রে ঘুম ভালোই হয়েছিল।

অপারেশনের খবর দিয়ে ৩১ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'রবীন্দ্রনাথের দেহে অস্ত্রোপচার' শিরোনামে জানিয়েছিল:

> অদ্য (বুধবার) সকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা বর্ত্তমানে সন্তোষজনক বলিয়া জানান হইয়াছে। বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, কেহ যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার বাড়ীতে না যান। প্রয়োজন বোঝা গেলে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে চিকিৎসকগণের বুলেটিন প্রকাশ করা হইবে।

রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের বুলেটিন

গত বুধবার রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের বাসভবন হইতে নিম্নোক্ত বুলেটিন প্রচারিত হয়:—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অস্ত্রোপচারের পর ভাল আছেন। ডাক্তারগণ সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কবিকে প্রফুল্ল অবস্থায় দেখা যায়। তিনি বাড়ীর লোকজনের সহিত সময়ে সময়ে দুই একটি কথাও বলিতেছেন। তাঁহার অসুখ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল বলিয়া অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন বর্ত্তমানেই বিবেচিত হইয়াছিল। বিশেষভাবেই এই উদ্দেশ্যেই কবিকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। —এ পি [৪৯]

পরদিন থেকে কবি মাঝে-মাঝেই অভিযোগ জানাচ্ছিলেন, ব্যথা করছে, জ্বালা করছে। দিনেরবেলা একটু ঘুমলেও দুপুর থেকেই কেমন যেন নিঃসাড়, রাতে ভালো ঘুম হত না।

পয়লা অগস্ট থেকে শারীরিক অবস্থা ক্রমশ যেন মন্দের দিকেই যাচ্ছিল। তাকাচ্ছেন যখন মনে হচ্ছে হয়তো কিছু বলবেন, কিন্তু না, কোনো কথা নেই, শুধু কষ্টের আওয়াজটুকু ছাড়া। সমানে হিক্কা উঠছিল, তাঁর বড়োই কষ্ট হচ্ছিল। রানী মহলানবিশ বড়ো এলাচ আর মিছরির গুড়ো মিশিয়ে জিভের উপর দিলে অন্তত সাময়িকভাবে হিক্কা ওঠা বন্ধ হল। তবে সারারাত আচ্ছন্ন হয়েই রইলেন।

সেদিন 'এসোসিয়েটেড প্রেস'-কে জানানো হয়,

"গত রাত্রিতে কবির অস্বস্তিতে রাত্রি কাটিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তিনি কতকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছেন। তাঁহার সাধারণ অবস্থা অপরিবর্তিত আছে।'[৫০]

পরদিন সকালে যেন একটু ভালো ছিলেন, অল্প কথাও বলছিলেন, কাছে ছিলেন যাঁরা সকলেই খুশি। দুপুর থেকে আবার আচ্ছন্ন, রাতটাও সেভাবেই কাটল। ক্রমেই শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি যে হচ্ছিল উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারছিলেন। ডাক্তাররা আসছিলেন-যাচ্ছিলেন, সেবক-সেবিকারা যথাকর্তব্য পালন করে চলেছেন। নাতবউ অমিতাও সংসারের কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এক-একবার আসছিলেন।

'এসোসিয়েটেড প্রেস' সূত্রে জানা যায় শনিবার দুপুরে প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, "কবি শান্তিতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার সাধারণ অবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে।"[৫১]

মৃত্যুর ছায়া ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসছিল। প্রতিমা দেবীর কাছে খবর গেল, তিন তারিখ সন্ধ্যায় তিনি কৃষ্ণ কৃপালনি ও শান্তিনিকেতনের ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছলেন। সেদিন আর দেখা করতে পারলেন না। পরদিন কবির ঘরে এলেন যখন তাঁর চেতনা এতটাই আচ্ছন্ন, বোঝানো গেল না যে তিনি এসেছেন, তাঁর মা-মণি। ৫ অগস্ট সকালে একটু যেন ভালো ছিলেন। প্রতিমা দেবী কানের কাছে বললেন, "আমি এসেছি— আপনার মা-মণি।" প্রসন্নদৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখলেন, বোঝা গেল চিনতে পেরেছেন। তিনি ধীরে-ধীরে তাঁকে একটু জল খাওয়ালেন, বিনা আপত্তিতে সেটুকু পান করলেন।

বিকেলবেলায় কবিকে দেখতে এলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার নীলরতন সরকার। সেদিন আর ডাকলেও কোনো

সাড়া নেই। ডাক্তার সরকার রবীন্দ্রনাথের পাশে বসলেন, অন্য ডাক্তারদের কাছ থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিবরণ নীরবে শুনলেন। যতক্ষণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ডানহাতটিতে হাত বোলাচ্ছিলেন। একসময় চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, দরজার দিকে যেতে-যেতে আবার ঘুরে এসে কবির মাথার কাছে খানিকক্ষণ চুপ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এতদিনের সুহৃদের সঙ্গে এ জন্মের এই শেষ দেখা। আমরা আগেই দেখেছি, জোড়াসাঁকোয় যখন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ, ডাক্তাররা সকলেই অবিলম্বে অপারেশনের পক্ষপাতী ছিলেন, একমাত্র ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁর অপারেশন-বিরোধী মতপ্রকাশে অটল ছিলেন। বলেছিলেন, এখানে যিনি রোগী তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যার দেহ একটি সুরে বাঁধা বাদ্যযন্ত্রের মতো, তাঁর আশঙ্কা বাইরের আঘাতে এই দেহযন্ত্রটাই বিকল হয়ে যেতে পারে, সেই ঝুঁকি নেওয়া অনুচিত।

নবীন চিকিৎসকরা রবীন্দ্রনাথের এই প্রবীণ চিকিৎসক বন্ধুর মতামত গ্রাহ্য করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। সবচেয়ে বিস্ময়কর কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের নির্বিকার এবং দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণ। কালিম্পঙে ইংরেজ সার্জেন যখন সেই রাত্রেই অপারেশন অত্যাবশ্যক বলে জিদ ধরে ছিলেন তখন প্রতিমা দেবী কিন্তু তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তাঁর একটা যুক্তি যেমন ছিল রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি, অন্য যে-যুক্তিটি তাঁকে দ্বিধাগ্রস্থ হতে দেয়নি, তা তাঁর বাবামশায়ের মত বা ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আস্থা। তিনি নিশ্চিত জানতেন রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে থাকলে কখনই অপারেশনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করতেন না। রথীন্দ্রনাথ

কি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর মত কী? একথা তো বহুবার কবি বলেছেন যেন প্রকৃতির নিয়মে তাঁর অস্তিত্ব ধীরে-ধীরে অবসিত হয়, গাছের শুকনো পাতা যেমন ঝরে পড়ে যায়। তিনিও তো তাই চেয়েছিলেন। একথাও বারবার বলতেন, তাঁর জীবনাবসান হবে শান্তিনিকেতনে।

ইতিমধ্যে কবিজীবন তাঁর শেষ লগ্ন পেরিয়ে অনন্তের অভিমুখে চলেছে তা-তে সন্দেহের অবকাশ কারও মনেই ছিল না। সকাল থেকেই আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য পরিচিতজনেরা কবিকে শেষ দেখা দেখতে ঘরে আসছেন, ওই ঘরেই কেউ-বা একধারে বসে আছেন। উৎকণ্ঠিত বিমর্ষ সকলেই। সকাল সাড়ে দশটায় ডাক্তার ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন, "বাহিরের বারান্দায় ও বসবার ঘরের সমস্ত লোক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করছিল ডাক্তারের অভিমত শোনবার জন্য। পরীক্ষা শেষে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। … ম্লান মুখে মৃদুস্বরে বললেন যে, 'We are not happy, এ কথা আগে থেকে জানিয়ে রাখাই ভাল।' শেষ আশার রেশটুকু মিলিয়ে গেল।" [৫২]

আজ ৬ অগস্ট রাখী পূর্ণিমা। এমন দিনে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গতরাত থেকেই স্যালাইন চলছে, অক্সিজেন ইত্যাদিও প্রস্তুত। মীরা দেবীর ব্যাকুল অনুনয়ে রথীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে রানী মহলানবিশ কবিরাজ বিমলানন্দের কাছে গিয়ে তাঁকে একবার জোড়াসাঁকোয় আসতে অনুরোধ করলেন। রানী লিখেছেন, "তিনি বিষণ্ণ মুখে বললেন, এখন আর আমাকে ডেকে কি লাভ? যখন ভালো করতে পারবো বলে খুবই নিশ্চিন্ত ছিলাম, তখন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অপারেশন করালেন।

এখন আর আমি মিথ্যে কেন যাবো? কারণ কিছুই তো করতে পারবো না। অনেক অনুনয় করে মিনতি করে বললাম, একবার শেষ চেষ্টা করুন। শুধু আমার খাতিরেই না হয় চলুন। আমি তো আত্মীয় নই, কিংবা চিকিৎসা বদল তো আমি করি নি। কিন্তু গুরুদেবকে ভালোবাসি তাই প্রাণের ব্যগ্রতায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আজ পূর্ণিমা, কাজেই বুঝতে পারছি আজ একটা বিপদ আছে। আপনি এই পূর্ণিমার যোগটা অন্তত যেমন করেই হোক কাটিয়ে দিন। বিমলানন্দ বললেন, ... একবার শেষ চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে ঐ এম. বি. ৬৯৩টা বন্ধ করতে হবে। আমার ওষুধের সঙ্গে ওটা বাধবে, তাতে আরো খারাপ হবে। ...

বিধানবাবু কবিরাজ ডাকবার প্রস্তাবে ভীষণ চটে গেলেন। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করোগে, এজন্যে আমার কাছে এসেছ কেন? তোমরা কি ভেবেছ আমি মত দেবো কবিরাজি চিকিৎসায়? আমি বললাম, বরাবরের জন্যে বলছি না, শুধু একটা দিন— আজকে পূর্ণিমার যোগটা কাটিয়ে দেবার জন্যে— একটা দিন শুধু এম. বি.টা বন্ধ করে দিন। রোজই তো খাওয়ানো হচ্ছে, কিন্তু দেখাই তো যাচ্ছে তাতে কোনো উপকার হচ্ছে না, তবে কেন ওটা একটা দিনের জন্যে বন্ধ করতেও আপত্তি করছেন?

দেখো, আমার সঙ্গে তর্ক করো না। এটা তোমার অনধিকার চর্চা। তুমি যদি এতই জানো তাহলে চিকিৎসা করলে পারতে তো, ডাক্তারদের ডেকেছিলে কেন? মনে মনে বললাম, সেজন্যে আমি দায়ী নই। তিনি বললেন, কবির এইরকম অবস্থায় একদিনের জন্যেও এম. বি. বন্ধ করা যাবে না। আমার মতে

আরো বেশী ডোজে দেওয়া উচিত হবে। আরও নানারকম কথা বলে আমাকে তিরস্কার করলেন।" [৫৩]

অপারেশন যে বিফল হয়েছে এবং কবি যে মৃত্যুপথযাত্রী, ডাক্তার রায়ের কি তখনও তা অজানা ছিল? সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় সাত দশক পরে ডাক্তার শ্যামল চক্রবর্তী কবির অপারেশন ও তার ফলাফল নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য মনে করি:

> ১৯৩৬ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ প্রথম মূত্রের নানা অসুবিধা বোধ করতে থাকেন। বারংবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছার মতো উপসর্গগুলোকে প্রথমদিকে রেচনপথের সংক্রমণ বলে মনে হলেও, মাঝেমধ্যে এরকম উপসর্গ কবিকে কষ্ট দিতে থাকে। ডাঃ নীলরতন সরকার ও অন্য চিকিৎসকরা কবিকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, প্রস্টেটগ্রন্থি বড় হয়ে মুত্রনালিতে অবরোধ (obstruction) এরকম সমস্যার কারণ। ...
>
> কবির অর্শের অস্ত্রোপচার হয়েছে ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে, ইংল্যান্ড আমেরিকা ও পশ্চিমের আরো কিছুদেশের খ্যাতনামা নানা চিকিৎসক ছিলেন কবির বিশেষ পরিচিত। এইসব দেশে কবির অনুরাগী মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। তবু কবির ওই অস্ত্রোপচার করবার আগে পশ্চিমের দেশের খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক বা অন্য চিকিৎসকদের মতামত কেন নেওয়া হল না, কেন অস্ত্রোপচারের জটিলতার কথা বলা হল না কবিকে, কবি পুত্রকে বা নিকট আত্মীয়দের, অনিবার্য এই প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলে না।
>
> অনেকের ধারণা, প্রস্টেটগ্রন্থির অস্ত্রোপচার করিয়ে জীবনাবসান হয়েছিল কবির। স্ফীত প্রস্টেট গ্রন্থি বাদ দেবার জটিল অস্ত্রোপচার তখন পরীক্ষামূলক ভাবে সবে শুরু হয়েছে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিছু দেশে। তখন এদেশে

ওই অস্ত্রোপচার করা ছিল অসম্ভব, কল্পনার বাইরে। তলপেটে ছোট্ট ছিদ্র করে মূত্রথলিকে মুক্ত করে দেওয়ার অস্ত্রোপচার 'সুপ্রাপিউবিক সিস্টোসটমি' করা হয়েছিল কবির। অস্ত্রোপচার করার কয়েকদিন বাদেই জীবনাবসান ঘটে রবীন্দ্রনাথের।

ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ অস্ত্রোপচারে। অস্ত্রোপচারের ফল এমন মারাত্মক হতে পারে জানলে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ, মানসপুত্র প্রশান্তচন্দ্র বা অন্য নিকটাত্মীয়রা অপারেশন করাতে মত দিতেন না। সেই সময়কার স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, বা ঘটনাক্রম তাই বলে। অস্ত্রোপচারে তার মাথার ঝাপসা ভাব কেটে যাবে, আরো দশ বছর নিশ্চিন্তে লিখতে পারবেন এমন আশ্বাস ডা. বিধান রায় না দিলে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে অস্ত্রোপচার করাতে সম্মত হতেন না, বলা বাহুল্য।

অস্ত্রোপচার না করালেও আর খুব বেশিদিন হয়তো বাঁচতেন না রবীন্দ্রনাথ। তবু এমন এক তীব্র অনুভূতি প্রবণ, সংবেদনশীল মহান স্রষ্টার শরীরে ওই অস্ত্রোপচার করাবার সময় অগ্রাহ্য করা হয়েছিল কবির বহুকালের বন্ধু ও চিকিৎসক ডা. নীলরতন সরকারের এ-সংক্রান্ত মতামত। শল্যচিকিৎসকরা বারবার ওই অস্ত্রোপচার করতে চেয়েছেন আগেই, বাধা দিয়েছেন স্যার নীলরতন।

প্রায় পঁয়ত্রিশবছর ধরে কবির যাবতীয় চিকিৎসার দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নীলরতন। কবির দেহযন্ত্রটিকে নীলরতন চিনতেন হাতের তালুর মতো। বললেন, রবীন্দ্রনাথের শরীর সুন্দর করে বাঁধা একটা তানপুরার মতো, সামান্য আঘাতেই যা ভেঙে পড়তে পারে। একটানা ওষুধ দিয়ে রেচনতন্ত্রের সংক্রমণকে আটকে রাখার পরামর্শ দিতেন নীলরতন। ১৯৪০-এর শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা চলেছে সে ভাবেই।

১৯৪১-এ বিধান রায়ের অস্ত্রোপচার করাবার সিদ্ধান্ত তখন স্ত্রীর মৃত্যুতে গিরিডির বাড়িতে শোকে মুহ্যমান নীলরতনকে জানানো

পর্যন্ত হয়নি। নীলরতনকে সব জানানো হয় অস্ত্রোপচারের পর কবি সেপ্টিসিমিয়ায় আক্রান্ত হবার পর।

কবির অন্তিম অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত শুধু একপেশে বা হঠকারিতা নয়, এক মহান প্রতিভাবানের জীবনের শেষ লগ্নে এ এক চরম অবিমৃষ্যকারিতা। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই ট্রাজিক পরিণতি বেদনাবহ।[৫৪]

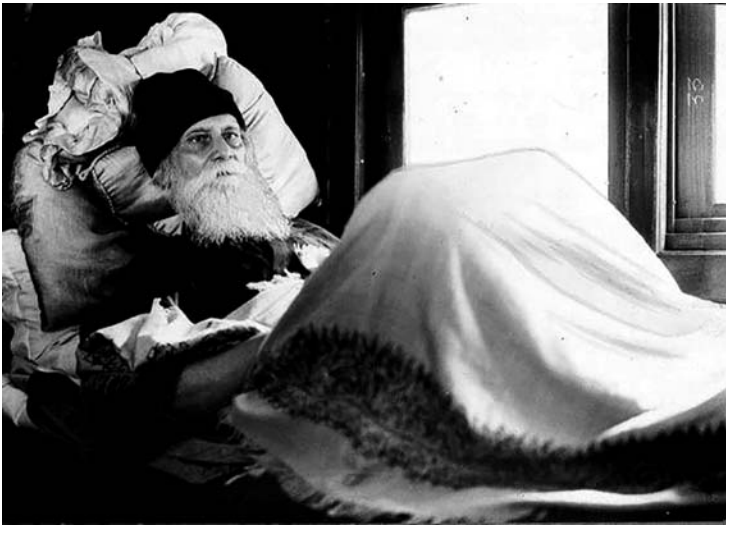

তবু উপসংহারটুকু এখনও বাকি।

ডাক্তার ললিত বাঁড়ুজ্যে তো সকালবেলাতেই সব আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছেন। কুমার জয়ন্তনাথ রায়ের কলমে সেই হতাশ সময়ের যে চিত্র ধরা আছে, আসুন আমরাও তার অংশভাক হই।

> সন্ধ্যা না হতেই বাহিরের লোকে ঘর ভরে গেল। অত বড় ঘরটিতে এতগুলি লোক, কিন্তু তবুও সমস্ত ঘর যেন মৃত্যুর মতো স্তব্ধ।
>
> রাত্রি এল। পূর্ণিমার রাত্রি। এই রাত্রে যারা যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে একটি চির স্মরণীয় রাত্রি। ঠিক বারটার সময় একটি

সঙ্কট-অবস্থা দেখা দিল কিন্তু তা কেটে গেল। আমরা ডাক্তার নই। সেইজন্যই হয়তো মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে রাত্রি তিনটায় সঙ্কট-অবস্থা যদি কেটে যায় তাহলে হ'য়ত পূর্ণিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত কেটে যেতে পারে, আর যদি পূর্ণিমা কেটে যায় তাহলে হয়ত— এই হয়ত পর্যন্তই মনে হচ্ছিল, তার পর আর কোন আশার কথা ভাবতে সাহস হচ্ছিল না। অন্ধকার ঘরে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে কয়েকটি প্রাণী ব'সে আছি। কখন তিনটা বাজবে। তিনটা বাজল। আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারা গেল অবস্থার নিম্নাভিমুখ দ্রুত পরিবর্তন। ডাক্তারের কথা শুনেও অ-ডাক্তার হয়ে যে ক্ষীণ আশা টুকু মনে ধরে রাখা হয়েছিল তা মুহূর্তের ভিতর শেষ হয়ে গেল। পূর্ণিমার নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। পরিপূর্ণ চন্দ্রমার আলো সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে অভিষিক্ত করছে। রাজপথ থেকে কদাচিৎ দু-একটি গাড়ির শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। আকশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আর কানে আসছে পাশের ঘর থেকে মুমূর্ষু পুরুষ সিংহের অন্তিম নিঃশ্বাস ধ্বনি।[৫৫]

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ভরা শ্রাবণের আকাশ যে কবির দৃষ্টিকে বারেবারে মুগ্ধ করেছে, সে দৃষ্টি আজ কোন অজানালোকের দিকে প্রসারিত।

হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার।।[৫৬]

রানী চন্দ সেই পূর্ণিমার রাত্রি ও পরদিনের সমাপন পর্বের বর্ণনা দিয়েছেন:

গুরুদেবের শিয়র বরাবর বাইরে পুবের আকাশে পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে দেখি পরিপূর্ণ ছবি একখানি। এই ছবিখানি যেন আজকের জন্যই দরকার ছিল। এমনটিই হবার কথা ছিল।[৫৭]

মাঝ রাত থেকে অবস্থার দ্রুত অবনতি হল। ৭ অগস্ট ১৯৪০, শ্রাবণের বাইশ। দিনের আলো ফোটার আগে থেকেই জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের কানাগলিটায় আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিত-আপরিচিতের দলের আসা শুরু হয়ে গেল। অঞ্জলি ভরে চাঁপা ফুল এনে কবির পায়ের ওপর ছড়িয়ে দিলেন নাতবউ অমিয়া ঠাকুর। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা করলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মন্ত্র পড়ছেন:

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।[৫৮]

বাইরের বারন্দায় গান হচ্ছে:

কে যায় অমৃতধামযাত্রী।
আজি এ গহন তিমির রাত্রি
কাঁপে নভ জয়গানে॥
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথপানে॥
ওগো রহো রহো, মোরে ডাকি লহো, কহো আশ্বাসবাণী।
যাব অহরহ সাথে সাথে
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে
অপরাজিত প্রাণে॥[৫৯]

বেলা ন-টা থেকে শুরু হল অক্সিজেন দেওয়া। সমাপনের লগ্ন ঘনিয়ে আসছে, নিশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, দেহের উত্তাপ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, বারোটা দশ মিনিটে শেষনিশ্বাস পড়ল। ধীরে-ধীরে বাইরে খবর ছড়িয়ে পড়ল, জমা হতে থাকল শত-শত মানুষ। সে ভীষণ কোলাহল! কবিকে বেনারসী জোড় পরিয়ে সাজানো হল। কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, পাট-করা চাদর, চন্দন-মালা-রজনীগন্ধা-শ্বেতকমল। বুকের মাঝে রাখা হাতে একটা পদ্মকোরক। রাজবেশে যেন রাজা ঘুমচ্ছিলেন রাজশয্যায়। রানী চন্দের কথায়, "তিনটে বাজতে হঠাৎ এক সময়ে গুরুদেবকে সবাই মিলে নীচে নিয়ে গেল। দোতলার পাথরের ঘরের পশ্চিম বারান্দা হতে দেখলাম— জন সমুদ্রের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকা নিমেষে দৃষ্টির বাইরে ভেসে চলে গেল।"[৬০]

সকাল থেকেই সস্ত্রীক এসেছিলেন সুশোভন সরকার, দেখলেন ছেলেরা বিচিত্রা বাড়িতে আর মেয়েরা সকলেই মহর্ষি ভবনের বারান্দায় কবির ঘরের আশেপাশে। অবাক হলেন দেখে ইতিমধ্যে কবিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য খাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ওদিকে প্রশান্তচন্দ্র অসুস্থ টেলিফোন এসেছে, ভুল খবর রটিয়ে রানীকে বরানগর পাঠিয়ে দেওয়া হল। সমগ্র ব্যবস্থাপনার কাণ্ডারি সজনীকান্ত দাস আর সম্ভবত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এই কর্মকর্তারা বিধান দিলেন যে মারা গেলে সূর্যাস্তের আগে দাহ করা উচিত, সেজন্য খাটের ব্যবস্থা করে রাখা হচ্ছে। শুনে বিস্মিত হলেন, যে নিবারণচন্দ্র ঘোষ অসুস্থ কবিকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগই করা হল না, তাঁকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে

যাওয়ার প্রশ্নে। "তাঁকে একবার বললে নিশ্চয় স্পেশাল ট্রেনে করে রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হতো। এবং তাঁর বড়দাদার মতন তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হতো শান্তিনিকেতনে যথোপযুক্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে।"[৬১]

রানী মহলানবিশ কিছুক্ষণের জন্য বরানগরে বাড়িতে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, ফিরলেন যখন, "জোড়াসাঁকোর আঙিনাতে নেবে দেখি জনসমুদ্র পার হয়ে উপরে যাওয়া অসম্ভব। ও-বাড়ির অন্যান্য অংশও চিনি বলে অন্য রাস্তায় সহজেই উপরে উঠতে পারলাম। ঘরের ভিতরে পৌঁছবার কয়েক সেকেন্ড আগেই শেষ নিঃশ্বাস থেমে গেছে। ... অমিতা আমাকে বলল, আর একটু আগে এসেও আপনি যদি পৌঁছতে পারতেন। ঠিক শেষ মুহূর্তের আগে ডান হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে উপরে তুলে কপালে ঠেকাতেই হাত পড়ে গেল।

ঘর লোকে লোকারণ্য।

একটু পরে সেবকসেবিকা ছাড়া আর সবাইকে ঘর থেকে চলে যেতে বলা হল। গুরুদেবকে স্নান করানো, সাজিয়ে দেবার কাজ এখনও যে বাকি আছে— সেবা তো সমাপ্ত হয়নি। মেয়েদের মধ্যে ঘরে শুধু আমি, বুড়ী আর অমিতা; আর ছেলেদের মধ্যে সুরেনবাবু, বিশু এবং আরো অনেকে।

যখন স্নান করানো হচ্ছে, নিচের জনতার মধ্যে একদল উপরে এসে বাইরে থেকে টান মেরে দরজার ছিটকিনি খুলে ঘরে ঢুকে পড়লো। কী দারুণ অপমান কবির চৈতন্যহারা এই দেহটার। যে মানুষের মন এত স্পর্শকাতর ছিল, যে মানুষ বাইরের লোকের সামনে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা কখনও

প্রকাশ করতে পারতেন না, সেই মানুষের আত্মাহীন দেহখানা অসহায় ভাবে জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে পড়ে রইল। তাড়াতাড়ি তাঁকে ঢাকা দিয়ে সুরেনবাবুরা সবাইকে ঠেলে বাইরে বের করে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করলেন। এক-একটা দরজায় এক-একজন পাহারা। ভিতর থেকে দরজায় ছিটকিনি সত্বেও হাত দিয়ে ঠেলে ধরে রাখা হয়েছে। তবু বাইরে থেকে প্রাণপণ ঝাঁকানি আর উন্মত্ত চীৎকার— দরজা খুলে দিন আমরা দেখবো।

তাড়াতাড়ি করে আমরা কাপড় পরানো শেষ করলাম। নাতনীই সাজালো, নাতবৌ আর আমি সাহায্য করেছি মাত্র— এই আমাদের শেষ সেবানিবেদন কবির পায়ে। ...

বেলা তিনটার সময় একদল অচেনা লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে নিমেষে আমাদের সামনে থেকে সেই বর বেশে সজ্জিত দেহ তুলে নিয়ে চলে গেল। যেখানে বসে ছিলাম সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। শুধু কানে আসতে লাগলো—'জয় বিশ্বকবির জয়, জয় রবীন্দ্রনাথের জয়, বন্দেমাতরম'। [৬২]

কবির এই অন্তিম যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতিমা দেবী স্মরণ করেছিলেন *জন্মদিনে* কাব্যের একটি কবিতার কয়েক ছত্র।

অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণ সজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা।
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।

কিন্তু সেই 'শুভ শঙ্খধ্বনি' আমাদের কানে পৌঁছবে কেন। আমরা যে মায়ার জীব, দিব্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই। এদিকে বৃহৎ সমুদ্রের

কলরব শুনছি বাইরে। জানালাদরজার উপর পড়ছে ভীষণ করাঘাত, যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গ আঘাতে সমস্ত বাড়িটা ভেঙে পড়বে। ভূমিকম্পের কাঁপন উঠছে চারি দিকে। কে যেন এসে বললে এইবার ওঁকে নিয়ে যাচ্ছে, শোক যাত্রা শুরু হবে। দৌড়ে দেখতে গেলাম জানালা দিয়ে, শেষ দর্শন হল না। একটা প্রকাণ্ড মানব সমুদ্রের ঢেউ তাঁর দেহ গ্রাস করে নিল চকিতে। যে-মহামানব তাঁর ধ্যানের উপলব্ধি, সেই বিরাট মানবহৃদয়ের সাগর থেকে আজ বান ডেকে উঠেছে। তারই উত্তাল তরঙ্গ তাঁর দেহকে পার্থিব জগৎ থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল, আর তাঁর মহান আত্মা ব্যাপ্ত হল ভূমার নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতায়।" [৬৩]

সুশোভন সরকারকে একবার বাড়িতে যেতে হয়, এবং দায়িত্ব ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে কলেজ ছুটি ঘোষণার। ফিরে দেখলেন জোড়াসাঁকোয় ঢোকা অসম্ভব, ইতিমধ্যে সমস্ত শহর যেন সেখানে ভেঙে পড়েছে।'তখন গাড়ি ফিরিয়ে যেতে হল ২১০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, মহলানবীশদের পৈত্রিক বাড়িতে। তার সামনে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেহ নিয়ে শোভাযাত্রা যাবে নিমতলা ঘাটে। শোভাযাত্রা গেলো, কিন্তু এত তীব্র বেগে যে রবীন্দ্রনাথকে শেষ বারের মতন দেখতেও পেলাম না। তখন দৌড়লাম নিমতলার ঘাটে, কিন্তু সেখানে ঢোকে কার সাধ্যি!

নিমতলা ঘাটের বাইরে উদ্ভ্রান্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হিরণকুমার সান্যালকে বলেছিলেন, হাবুল, It's going to make a difference. আর আমার আজও মনে হয়, And, what a difference!' [৬৪]

সেই লজ্জাকর পরিস্থিতির কথা আর একবার স্মরণ করতে ইচ্ছা করে না। প্রশান্তচন্দ্র তখন গুরুতর অসুস্থ, আসতে পারেননি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শোকে মুহ্যমান ছিলেন! তবুও শান্তিনিকেতন ও কলকাতার বহু বিশিষ্ট ও দায়িত্বশীল মানুষ রবীন্দ্রনাথের অপারেশনের সময় থেকেই জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউই কেন সময় থাকতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতে পারেননি? মনে হয় তাহলে অন্তত কবির শেষযাত্রা যথাযথ অভিজাত মর্যাদায় সম্পন্ন হতে পারত। আর তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা কি কারও মনে ছিল না? এ কেমন উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেলেন!

মৃত্যুঞ্জয়

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে
তোমার সম্মুখে
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত —
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, ‘ আরো কিছু আছে নাকি,

আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?'
নামিল আঘাত।
এইমাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো ব'লে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

সূত্র:

১। *চিঠিপত্র*, নবম খণ্ড; পত্র ৫: পৃ. ৪৪২, বিশ্বভারতী

২। *চিঠিপত্র*, একাদশ খণ্ড; পত্র ১৩৪: পৃ. ৩৪১, বিশ্বভারতী

৩। প্রতিমা ঠাকুর; *নির্বাণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; কার্তিক ১৩৮৮

৪। *চিঠিপত্র*, একাদশ খণ্ড; পত্র ১৩৫: ৩৪২-৪৩

৫। প্রতিমা ঠাকুর; *নির্বাণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; কার্তিক ১৩৮৮

৬। *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা*, চতুর্থ খণ্ড, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সহযোগী স্বপ্না ঘোষ, আনন্দ পা প্রা লি, জানুয়ারি ১৯৯৮

৭। প্রতিমা ঠাকুর; *নির্বাণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; কার্তিক ১৩৮৮

৮। Sabyasachi Bhattacharya, Compiled and Ed, *The Mahatma and the Poet*, National Book Trust, New Delhi, 1997

৯। নির্মলকুমারী মহলানবিশ; *বাইশে শ্রাবণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলিকাতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩

১০। তদেব ৬০-৬১

১১। প্রতিমা ঠাকুর; *নির্বাণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; কার্তিক ১৩৮৮

১২। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা; ২৫ বৈশাখ ১৪০৮/ মে ২০০

১৩।রানী চন্দ; *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; শ্রাবণ ১৩৯৪

১৪। নির্মলকুমারী মহলানবিশ; *বাইশে শ্রাবণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলিকাতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩

১৫। প্রতিমা ঠাকুর; *নির্বাণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; কার্তিক ১৩৮৮
১৬। তদেব: ৩৩
১৭। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চবিংশতি খণ্ড, *পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা; ২৫ বৈশাখ ১৪০৮/ মে ২০০*
১৮। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩৪৭
১৯। তদেব
২০। তদেব
২১। রানী চন্দ; *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; শ্রাবণ ১৩৯৪
২২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৪৭
২৩। রানী চন্দ; *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; মাঘ ১৩৭৭
২৪। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চবিংশতি খণ্ড, *পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা; ২৫ বৈশাখ ১৪০৮/ মে ২০০*
২৫। শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা; জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯
২৬। রানী চন্দ; *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; মাঘ ১৩৭৭
২৭। Sabyasachi Bhattacharya, Compiled and Ed, *The Mahatma and the Poet*, National Book Trust, New Delhi, 1997
২৮। নির্মলকুমারী মহলানবিশ; *বাইশে শ্রাবণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলিকাতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩
২৯। শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা; জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯
৩০। বুদ্ধদেব বসু; *প্রবন্ধ সংকলন*, ভারবি, কলিকাতা, ১৯৬৬
৩১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'প্রবাসী',

৩২। সোমেন্দ্রনাথ বসু (স.), *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ প্রবাসী* (১৩০৮-১৩৪৮), টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা; সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
৩৩। *চিঠিপত্র* ষোড়শ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ৭ পৌষ ১৪০২
৩৪। প্রতিমা ঠাকুর; নির্বাণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; কার্তিক ১৩৮
৩৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চবিংশতি খণ্ড: ৮১-৮২
৩৬। নির্মলকুমারী মহলানবিশ; *বাইশে শ্রাবণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলিকাতা; ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩
৩৭। তদেব
৩৮। রানী চন্দ; *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; শ্রাবণ ১৩৯৪
৩৯। তদেব
৪০। নির্মলকুমারী মহলানবিশ; *বাইশে শ্রাবণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলিকাতা; ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩
৪১। রানী চন্দ; *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; শ্রাবণ ১৩৯৪
৪২। তদেব
৪৩। তদেব
৪৪। তদেব
৪৫। তদেব
৪৬। অমিতাভ চৌধুরী, *সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ*; দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা; বৈশাখ ১৩৮৭
৪৭। নির্মলকুমারী মহলানবিশ; *বাইশে শ্রাবণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলিকাতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩
৪৮। রানী চন্দ; *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; শ্রাবণ ১৩৯৪
৪৯। তদেব

৫০। তদেব
৫১। তদেব
৫২। জয়ন্তনাথ রায়; 'বিশ্বকবির মহানির্বাণ'; 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৪৮
৫৩। নির্মলকুমারী মহলানবিশ; *বাইশে শ্রাবণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলিকাতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩
৫৪। ডা. শ্যামল চক্রবর্তী, *রবি ঠাকুরের ডাক্তারি*, পত্রভারতী, কলকাতা; মে ২০১৮
৫৫। জয়ন্তনাথ রায়; 'বিশ্বকবির মহানির্বাণ'; 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৪৮
৫৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; পৌষ ১৩৮০
৫৭। রানী চন্দ; *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; শ্রাবণ ১৩৯৪
৫৮। *ব্রাহ্মধর্ম*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা; ১৯৭৫
৫৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; পৌষ ১৩৮০
৬০। রানী চন্দ; *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; শ্রাবণ ১৩৯৪
৬১। *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা*, চতুর্থ খণ্ড, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সহযোগী স্বপ্না ঘোষ, আনন্দ পা প্রা লি, জানুয়ারি ১৯৯৮
৬২। নির্মলকুমারী মহলানবিশ; *বাইশে শ্রাবণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলিকাতা; ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩
৬৩। প্রতিমা ঠাকুর; *নির্বাণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা; কার্তিক ১৩৮
৬৪। *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা*, চতুর্থ খণ্ড, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সহযোগী স্বপ্না ঘোষ, আনন্দ পা প্রা লি, জানুয়ারি ১৯৯৮

পরিশিষ্ট ১

মিস ইলিনর রাথবোনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি: REPLY TO MISS RATHBONE

I HAVE BEEN deeply pained at Miss Rathbone's open letter to Indians. I do not know who Miss Rathbone is but I take it that she represents the mentality of the average 'well-intentioned' Britisher. Her letter is mainly addressed to Jawaharlal and I have no doubt that if that noble fighter of freedom's battle had not been gagged behind prison bars by Miss Rathbone's countrymen, he would have made a fitting and spirited reply to her gratuitous sermon. His enforced silence makes it necessary for me to voice my protest even from my sick bed. The lady has ill served the cause of her people by addressing so indiscreet, indeed impertinent, a challenge to our conscience. She is scandalised at our ingratitude, -that having 'drunk deeply at the wells of English thought' we should still have some thought left for our poor country's interests.

English thought, in so far as it is representative of the best traditions of western enlightenment, has indeed taught us much, but let me add, that those of our countrymen who have profited by it have done so despite the official British attempts to ill educate us. We might have achieved introduction to Western learning through any other European language. Have all the other peoples in the world waited for the British to bring them enlightenment? It is sheer insolent self-complacence on the part of our so called English friends to assume that had they not 'taught' us we would still have remained in the dark ages. Through the official British channels of education in India have flowed to our children in schools not the best of English thought but its refuse, which has only deprived them of a wholesome repast at the table of their own culture.

Assuming, however, that English language is the only channel left to us for 'enlightenment', all that 'drinking deeply at its wells' has come to us in 1931, even after a couple of centuries of British administration, only about one percent of the population was found to be literate in English, ---while in the USSR in 1932, after only fifteen years of Soviet administration, 98 percent of the children were educated. (These figures

are taken from The Statesman's Year-Book, an English publication, not likely to err of the Russian side). But even more necessary than the so-called culture are the bare elementary needs of existence, on which alone can any superstructure of enlightenment rest.

And what have the British, who held tight the purse strings of our nation for more than two centuries and exploited its resources, done for our poor people? I look around and see famished bodies crying for bread. I have seen women in villages dig up mud for a few drops of drinking water, for wells are even more scarce in Indian villages than schools.

I know that the population of England itself is to-day in danger of starvation and I sympathise with them, but when I see how the whole might of the British navy is engaged in convoying food vessels to the English shores and when I recollect that I have seen our people perish of hunger and not even a cartload of rice brought to their door from the neighbouring district, I cannot help contrasting the British at home with the British in India.

Shall we be then grateful to the British, if not for keeping fed, at least for preserving law and order?

I look around and see riots raging all over the country. When scores of Indian lives are lost, our property looted,

our women dishonoured, the mighty British arm stir in no action, only the British voice is raised from overseas to chide us for unfitness to put our house in order.

Examples are not wanting in history when even fully armed warriors have shrunk before superior might, and contingencies have arisen in the present war when even the bravest among the British, French and Greek soldiers have had to evacuate the battlefield in Europe because they were overwhelmed by superior armaments,— but when our poor, unarmed and helpless peasants, encumbered with crying babes, flee from homes unable to protect them from armed goondas, the British officials, perhaps smile in contempt at our cowardice !

Every British civilian in England is armed to-day for protecting his hearth and home against the enemy, but in India even lathi-training was forbidden by decree. Our people have been deliberately disarmed and emasculated in order to keep them perpetually cowed and at the mercy of their armed masters,

The British hate the Nazis for merely challenging their world-mastery and Miss Rathbone expects us to kiss the hand of her people in servility for having riveted chains on ours. A Government must be judged not by pretensions of its spokesman but by its actual and

effective contribution to the wellbeing of the people.

It is not so much because the British are foreigners that they are unwelcome to us and have found no place in our hearts, as because, while pretending to be trustees of our welfare, they have betrayed the great trust and have sacrificed the happiness of millions in India to bloat the pockets of a few capitalists at home.

I should have thought that the decent Britisher would at least keep silent at these wrongs and be grateful to us for our inaction, but that he should add insult to injury and pour salt over our wounds, passes all bounds of decency.

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্র-প্রয়াণ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন

৮আগস্ট ১৯৪১/২৩ শ্রাবণ ১৩৪৮

ভারতের গৌরব-রবি রবি অস্তগত

মানবহিতব্রতী মহামানবের মহাপ্রয়াণ

কলিকাতার রাজপথে বিরাট শোভাযাত্রা

অগণিত নরনারীর শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন

কবির দেহসহ দুই ঘণ্টা কাল সহর পরিভ্রমণ

শ্মশান ভূমিতে শোকভারে মুহ্যমান

সহস্র সহস্র নরনারী

কবির গৃহ হইতে বাহির হইয়া শোক যাত্রাটি ধীরে ধীরে আপার চীৎপুর রোড, বিবেকানন্দ রোড, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট ও বটকেষ্ট পাল এভিনিউ দিয়া যখন অগ্রসর হইতে থাকে, তখন ঐসব রাজপথের গৃহশীর্ষ ও গাড়ী বারান্দায় সমবেত জনতা কবির দেহের উপর পুষ্প, গোলাপজল এবং খৈ বর্ষণ করিতে থাকে। উহার উপর পথিমধ্যেও অসংখ্য পুষ্পমাল্য অর্পিত হয়। কলেজ ষ্ট্রীটে ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটেই লোকের ভিড় সমধিক হয়।

গোলদীঘি হইতে হেদুয়া পর্যন্ত সমস্ত রাজপথটি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তথায় কেবল অগণিত নরমুণ্ডই দৃষ্টি পথে পতিত হয়। দেশবরেণ্য কবির প্রতি দেশবাসীর শেষ শ্রদ্ধানিবেদনের এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হন। শোকযাত্রাটি শবদাহ ঘাটে পৌঁছান পর্য্যন্ত পথিমধ্যে কবির দেহের উপর যেসব পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়, তাহা একত্র করা হইলে উহার উচ্চতা তিন ফুট হয়।

কবির দেহ লইয়া দুই ঘণ্টা সহরের রাজপথে পরিভ্রমণ

শোকযাত্রাটি সহরের বিভিন্ন রাজপথে প্রায় দুইঘণ্টা কাল ৫ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া বেলা ৫-৪০ মিনিটের সময় নিমতলা শবদাহ ঘাটে উপনীত হয়।

নিমতলা শবদাহ ঘাটের যে স্থানে কবির শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, তাহা নিমতলা শবদাহ ঘাটের কলিকাতা কর্পোরেশনের জায়গার অন্তর্ভুক্ত। ঐ স্থানটি দেওয়াল দ্বারা ঘেরা এবং গঙ্গার তীরে অবস্থিত। জনতার ভিড় নিবারণের জন্য ঐস্থানটির এবং উহার আশেপাশের চতুর্দ্দিক পূর্ব্ব হইতেই সারি দিয়া লোক দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

নিমতলা ঘাটে ও আশেপাশে লোকের ভিড়

নিমতলা শবদাহ ঘাটে শোকযাত্রাটি পৌঁছাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তথায় হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়। নিমতলা শবদাহ ঘাটে যাইবার পথগুলিও লোকে লোকারণ্য হয়। কবির

নশ্বর দেহ দাহ করার জন্য যে স্থানটি নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল, তাহার চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের উপর বহু লোক পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক কবির দেহের উপর শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ অর্পণের জন্য দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসে তখন নিমতলা শ্মশানঘাটে বিশাল জনসমুদ্রের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়। ট্রাম, বাস ও মোটরগাড়ী নরনারীতে ভর্ত্তি হইয়া মিনিটে মিনিটে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইতে থাকে। পিপীলিকাশ্রেণীর মত অগণিত জনতা পদব্রজে শ্মশানঘাটে সমবেত হয়। যতদূর দেখা যায় গঙ্গা তীরে অগণিত নরমুণ্ড ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। গঙ্গার অপর পার হইতে নৌকা বোঝাই নরনারী আসিতেছিল।। শ্মশানের দৃশ্য দেখিবার জন্য অনেক নৌকায় আরোহীরা নদীর মধ্যে নোঙ্গর করিয়া রহিল। যে যেখানে যেটুকু জায়গা সংগ্রহ করিতে পারিল তাহাই দখল করিল। রেলওয়ে ভ্যানের ছাদ, বৃক্ষ, মোটরগাড়ীর হুড কোথাও তিলমাত্র জায়গা অবশিষ্ট রহিল না।

সন্ধ্যার পর জনতা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্মশানের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং প্রবেশ পথে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। সকলেই কবিবরের শেষ দর্শন লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। ব্যগ্রতা এত বেশী হইয়াছিল যে, কেহ কেহ শ্মশানে আনীত অজানা লোকের শবাধারে কাঁধ দিয়া ভিতরে ঢুকিবার পথ করিয়া লইল। ভীড় এত বেশী হইয়াছিল যে, শ্মশানঘাটের কলাপসিবল গেট ভাঙ্গিয়া যায় এবং জনতা ভীড় করিয়া ভিতরে প্রবেশ লাভ করে। জনতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পরে খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের

শব শোভাযাত্রা শ্মশান ঘাটে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বে দাহের জন্য কয়েকটি শব শ্মশানে আনীত হইয়াছিল, কিন্তু ভীড়ের জন্য, তাহাদিগকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। অত্যধিক ভীড়ের চাপে শ্মশানঘাটে রবীন্দ্রনাথের শবাধারের বেষ্টনী একবার ভাঙ্গিয়া যায় এবং দর্শনাকাঙ্ক্ষী জনতাকে আয়ত্তাধীনে রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। সেজন্য দুইঘণ্টার অধিককাল দাহকার্য্য স্থগিত রাখিতে হয়।

সন্ধ্যা ৮টা ১৫মিনিটের সময় দাহকার্য্য আরম্ভ হয়। আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থতা নিবন্ধন পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। কবির পৌত্র এবং পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখাগ্নি ক্রিয়া করেন। মুখাগ্নির সময় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। শ্রাবণী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র যখন সবেমাত্র পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছিল এবং পবিত্র সলিলা গঙ্গাবক্ষে তাহার শত সহস্র প্রতিবিম্ব তরঙ্গায়িত হইয়া ভগবানের একত্ব ও অসীমত্বের সাক্ষী দিতেছিল তখন সেই একত্ব ও অসীমত্বের চির পূজারী রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহকে কেন্দ্র করিয়া লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উহাকে পঞ্চভূতে বিলীন করিয়া ফেলে।

PHONE : B.B. 4281 & 4282

আনন্দবাজার পত্রিকা

REGD. NO. C. 1888

ANANDA BAZAR PATRIKA

DAILY NET SALE 65,679 ESTABLISHED 1878 দৈনিক নীট বিক্রয় সংখ্যা ৬৫,৬৭৯

Tele:—Anandabazar, Cal.

২০শ বর্ষ, ১৪৮তম সংখ্যা]•[কলিকাতা, শুক্রবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৮, AUGUST 8 1941]•[১০+৬ পৃষ্ঠা এক আনা

রবি অস্তমিত ঃ জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঃ ৮১ বৎসর বয়সে জীবনদীপ নির্ব্বাণ

আবির্ভাব—বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ ইং ১৮৬১ সালের ৭ই মে সোমবার রাত্রি ২টা হইতে ৩টার মধ্যে।

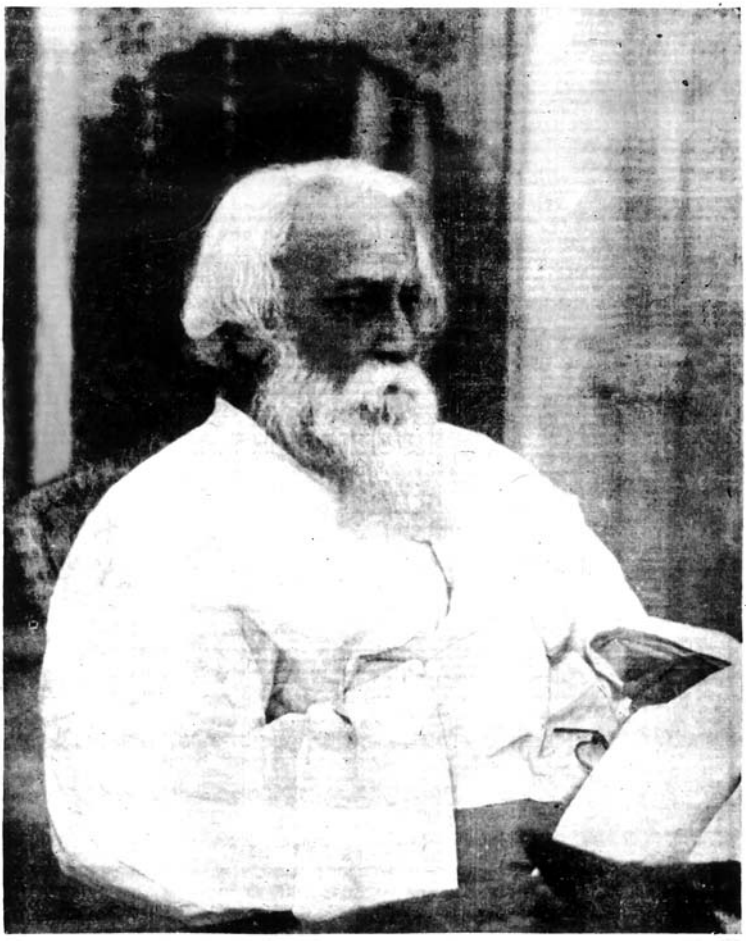

"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই"
—রবীন্দ্রনাথ

তিরোভাব—বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ইং ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট বেলা ১২টা ১০ মিঃ।

REGD. No. C 2443

হাবুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সিংহ মার্কা গেলের পাচন

যুগান্তর

JUGANTAR

Telegrams—"JUGANTAR"

সুর গ্রামোফোন

১৩৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা

Phone :—B. B. 6010 & B. B. 6011

৪র্থ বর্ষ ৩২০শ সংখ্যা | কলিকাতা শুক্রবার ২৩শে শ্রাবণ ১৩৪৮ | 8th AUGUST 1941 | কলিকাতা সংস্করণ | ১২ পৃষ্ঠা তিন পয়সা

ভারতের গৌরব-রবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ

পুষ্প-চন্দন বিভূষিত নশ্বরদেহ লইয়া শবযাত্রা

লক্ষ লক্ষ নরনারীর যোগদান

যাত্রাপথে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কবিগুরুর শবাধারে পুষ্পমাল্য অর্পণ : সর্বত্র অভিনব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃশ্য

[illegible]

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে জোড়াসাঁকো বাসভবনে রবীন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

অমূল্য জীবন রক্ষায় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা বিফল

পরিজন বেষ্টিত অবস্থায় ৮০ বৎসর ৩ মাস বয়সে গৌরবদীপ্ত কর্মময় জীবনের অবসান

শেষ ইচ্ছানুযায়ী নিমতলা মহাশ্মশানে নশ্বরদেহ ভস্মীভূত

গতকল্য বৃহস্পতিবার বেলা ১২-১৩ মিঃ সময় বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থিত বাসভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ৩ মাস হইয়াছিল।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯-১০ মিঃ সময় ডাক্তারগণ কবি রবীন্দ্রনাথের নাড়ীর অবস্থা সামান্য ভাল দেখিয়া তাঁহার শ্বাসকষ্ট লাঘব করিবার জন্য সর্বপ্রথম অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগ করেন।

বেলা ১০টার সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ ললিতমোহন ব্যানার্জী কবিকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, কবির অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক।

কবির একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যাহ্ন প্রায় ১২টার সময় শেষবার তাঁহার পিতাকে দর্শন করেন; [illegible]

মহরে শোকের ছায়াপাত—

[illegible]

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

কবিগুরুর মৃত্যুতে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি

বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন

"শুধু শ্রেষ্ঠতম কবি নহে, জাতীয়তাবাদী ও মনুষ্য সমাজ হিতৈষী মহামনীষীর মৃত্যু"—মহাত্মা গান্ধীর বাণী

ওয়ার্ধা, ৭ই আগষ্ট

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তির পরে মহাত্মা গান্ধী বলেন,—

"[illegible]"

মহাত্মাজীর তার

[illegible]

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি

[illegible]

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

[illegible]

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

[illegible]

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

পুত্রবধূ—প্রতিমা দেবী